KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন, (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/- ৬/- ৬/- ৬/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ আষাঢ়, ১৩৬৫ শ্রাবণ, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 June '58 (0.50) SAMAKALIN

47—3285

আপনার জামাকাপড় কাচবার জন্যে সেরা
—টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান

আপনার জামাকাপড়ের বিশেষ যত্ন নিতে হ'লে টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবানে কাচুন! এই সাবান ব্যবহার করলে জামাকাপড় ধবধবে পরিষ্কার থাকে — খুব মিহি কাপড়েরও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। জামাকাপড় কাচতে হ'লেই টাটার ৫০১ স্পেশাল সাবান ব্যবহার করবেন!

নতুন মলাটে ও লাল রঙের
মোড়ক দেখে নেবেন।

টাটা অয়েল মিলস্ কোং লিঃ

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ষ ষ্ঠ ব র্ষ
আষাঢ় ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

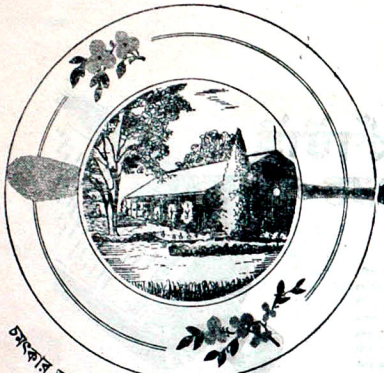

নীল দিগন্তে তরঙ্গায়িত পাহাড়, উপত্যকার প্রান্তে প্রকৃতির আরণ্য সৌন্দর্য, হুড্রু নির্ঝর ও মনোরম আবহাওয়ার জন্যই রাঁচীর খ্যাতি।

রাঁচী
হোটেল

আর দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের চমৎকার আহার্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রাঁচীকে কম খ্যাতিমান করেনি।

চমৎকার আহার্য ও আবাসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

সোনা-রং বালুরাশি, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, অনন্যা বেলাভূমি, আর মহিমান্বিত মন্দির এ সবই তো পুরীর আকর্ষণ।

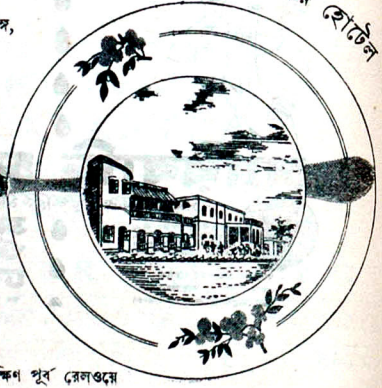

পুরী
হোটেল

কিন্তু পুরীতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেলে থাকার মতো মনোরম বোধহয় আর কিছু নেই।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ আষাঢ় ॥ ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা। সোমেন বসু ১৬১
যুগ-মানস। সনৎকুমার রায়চৌধুরী ১৭৩
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ১৬৮
গ ল্প ॥ কাগজের নৌকা। সরিৎশেখর মজুমদার ১৭৭
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩
ক বি তা ॥ স্বরগ্রাম। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ১৯৩
জীবন-জিজ্ঞাসা। উৎপল চৌধুরী ১৯৪
আ লো চ না ॥ সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ। দুর্গাদাস সরকার ১৯৫
স ং স্কৃ তি প্র স ঙ্গ ॥ আধুনিক চিত্রকলা। মীরা দত্ত ১৯৯
'সৌমিত্র সংঘ'এর দুই পুরুষ। অমিতা চৌধুরী ২০২
স মা জ স ম স্যা ॥ উপেক্ষিত ভিত্তি। সুব্রতেশ ঘোষ ২০৩
স মা লো চ না ॥ ইতিহাসের মুক্তি * বাংলার নব্যসংস্কৃতি *
সাহিত্যপাঠের ভূমিকা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২০৬
বিদ্রোহে বাঙালী বা আমার জীবনচরিত। সোমেন বসু ২০৮

সম্পাদক
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

সতীর্থকে সাহায্য করুন

সতীর্থকে বিপদে সাহায্য করা—বুদ্ধিহীন বা অসঙ্গত কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে যথার্থ সঙ্গত কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করাই তো প্রকৃত সতীর্থের কাজ। কোন সতীর্থকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে দেখলে তাকে বুঝিয়ে দিন যে, এ কাজ দুর্নীতিরই সামিল—ন্যায্য ভাড়া তার মিটিয়ে দেওয়াই উচিত; কিন্তু তা' না করে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে টিকিট পরীক্ষকের উপর যদি আপনি হামলা করেন তা'তে বন্ধুকে সাহায্য করা হয় না—এক অন্যায়ের দ্বারা আর এক অন্যায়কে ঢাকবার চেষ্টা করা হয় মাত্র।

পূর্ব রেলওয়ে

হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতা

সোমেন বসু

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আজকের লেখাপড়া জানা সাধারণ বাঙ্গালী হেমচন্দ্রের কবিতা আদৌ পড়েন না। তাঁরাই পড়েন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বলে পড়তে বাধ্য হন। এই পরিণাম শুধু হেমচন্দ্রের নয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকেরই ওই এক দশা। নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ আরও অনেকেই লাইব্রেরীর সামগ্রী হয়েছেন। ক্ষীরোদ প্রসাদ ও অমৃতলালের পৌরাণিক নাটক ছাত্রমহলে যে অভ্যর্থনা পায় তা বলার নয়। এর একমাত্র কারণ এই যে এঁদের সেই ধরণের সৃষ্টি ক্ষমতা ছিলনা যার দ্বারা এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যার আবেদন শুধু নিজেদের কালেই সীমাবদ্ধ নয়। কবিখ্যাতির প্রতি লোভ ছিল এঁদের, সমকালীন জনসাধারণ কি চায় তা তাঁরা প্রায় সঠিক জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতা ও প্রজ্ঞা ছিলনা, মধুসূদনের মত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল না, ছিলনা বিহারীলালের মত নিরাসক্ত আন্তরিক সংগীতোচ্ছ্বাস। তাই কষ্ট কল্পনার চিহ্ন প্রকট, একই ভাবের পুনরাবৃত্তি দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে, বিকৃত কল্পনাশক্তি পৌরাণিক ভাবালুতার পটভূমিকায় হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। তবু সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের নাম সশ্রদ্ধ উল্লেখলাভের যোগ্য কারণ কালের প্রবাহ থেকে তাঁরা বিচ্যুত ছিলেন না যদিও কালোত্তীর্ণ তাঁরা নন তাঁরা একান্তভাবে কালগত।

একসময়ে হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা বাংলা সাহিত্যের আসরে সাড়া তুলেছিল। হেমচন্দ্র বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদালাভ করেছিলেন। দেশপ্রেমের মন্ত্র তাঁর লেখনীতে ঝংকৃত হয়েছিল, তাঁর ভাষা ও ভঙ্গী তখনকার কালের সুধীসমাজের চিত্তবিনোদন করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুরু করে পরবর্তীকালের বহু চিন্তাশীল সমালোচকেরাও তাঁর কবিত্বশক্তির শতকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বল্লেন, যে মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্গকবির আসন শূন্য হয়নি — হেমচন্দ্র আছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন "A fine sensibility, a quick sportive imagination, and an exquisite sense of the beautiful as well as chasteness of thought and grandeur of conception mark his poetry. লাখকথার এককথা বলে দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালী যাহা চায় হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।"

পূর্ববঙ্গের কালীপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্গেন হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার — মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক ঊর্ধে অবস্থিত।" তখনকার দিনের বাংলার সমাজ জীবনে, ধর্মজীবনে এবং রাজনীতির জীবনে পাশ্চাত্যমোহের প্রাথমিক অন্ধতা কেটেছে — তখন প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে বিপরীত দিকে। একদিকে পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগরের প্রচণ্ড কর্মোদ্যম, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রয়াস অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের বিস্তৃত পটভূমিতে মধুসূদনের নির্ভীক পদচারণা। দেশাত্মবোধ তখন রাজস্থানী বীরাঙ্গনাকে কেন্দ্র করে বাংলা পদ্যে সবে মাত্র ঝঙ্কার তুলছে। হেনকালে সদ্যজাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে, ইংরাজী কবিতার সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে, সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে স্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপে এলেন হেমচন্দ্র।

তখনই প্রশ্ন উঠেছে বাঙ্গালীর মনে যে, আমাদের ইতিহাস নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রবণ কবিচিত্ত মনে মনে প্রাচীন গৌরবের এক পরমোজ্জ্বল কাহিনী গড়ে তুললো। সে কাহিনীর মূলে সত্য ছিল। তার উপরে জাতীয় কামনা বাসনার প্রলেপ পড়লো। প্রাচীনভারত আর স্বর্গেরকল্পনা এক হয়ে গেল। তখন মনে মনে গড়া সেই ঐশ্বর্যময়ী ভারতবর্ষের স্মরণে কান্নার স্রোত বইতে লাগল। যে বর্তমান সামনে রয়েছে তাকে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বোঝেন নি বোঝবার চেষ্টাও করেন নি। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা তাঁরা কেউই নন। তবে সেই মুহূর্তে কোন্ কথা বললে কবি-খ্যাতি সহজলভ্য হবে তা তাঁরা উভয়েই জানতেন। রঙ্গলালের পর দেশাত্মবোধক গান ও কবিতাকে প্রথম রচনা করেন এ প্রশ্ন তুলে নবীনচন্দ্র নিজের ভাগে ষোল আনা কৃতিত্ব দাবী করেছেন। তাঁর বক্তব্য আলোচনা করলেই দেখবো যে কাব্যরচনা তাঁর অন্তরের বস্তু ততটা নয় যতটা তাঁর খ্যাতি ও সম্মানের লোভ। তিনি বলছেন — "আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিলনা। হেমবাবুর 'ভারতসঙ্গীত' আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতার পর প্রকাশিত হয়। * * * বোধহয় শিশিরবাবু গদ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রু-বর্ষণ করি। চত্বারিংশৎ বৎসর পরে সেই স্বদেশ প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর ধারা কলনাদিনী ভাগীরথী-রূপে কর্জ্জন ঐরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে।" দেশপ্রেম তখন একটা নতুন বিলাস, অন্ততঃ একটা অন্ধ আবেগজাত হৃদয়োচ্ছ্বাস ছাড়া অধিকাংশ লোকের কাছেই আর কিছু নয়। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-মধুসূদনের গভীর দৃষ্টি নেই, আছে স্রোতে-ভাসা জনপ্রিয়তা অর্জনের ব্যাকুল কামনা। তবে এ কথা ঠিক যে হেমচন্দ্র লঘু প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁর অন্তরে মানবজীবনের বহু গভীরতার আবেদন পৌঁছেছিল। তাঁর চিন্তায়, তাঁর বাচনভঙ্গীতে একটি ভদ্রতা, একটি গাম্ভীর্য একটি শোভনতার পরিচয় সর্বত্রই আছে। কখনো কখনো ভাষার প্রয়োগ এত চেষ্টিত এবং কষ্ট-কল্পিত যে ভাববিকাশের পক্ষে তা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হেমচন্দ্র তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। দেশপ্রেমের আবেগ জেগেছে মনে কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। তখন ইংরাজী সাহিত্য পড়া দেশাত্মবোধের জোয়ার চলেছে। দেশ সম্বন্ধে, দেশের অধিকার সম্বন্ধে, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠে নি। স্বভাবতঃই সেই দেশাত্মবোধের অন্ধ আবেগ প্রাচীন ভারত-বর্ষের স্মৃতি মন্থন ছাড়া অন্য কোন পথ পায়নি। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক সকল কবিতারই সুর এক — অতীত ভারতবর্ষের গৌরব কোথায় গেল — ভারতবর্ষ কি আর জাগবেনা — এই আক্ষেপই তাঁর একমাত্র কথা। আজ আমাদের দেশপ্রেম নানা ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে ঐ আক্ষেপের আর অবকাশ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের

ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নেই — তবে ইংরেজ বিধবাবিবাহ চালু করতে বলছে, লবণ কর বসাতে চাইছে, এতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি। রঙ্গলালের স্বাধীনতা হীনতায় কন্ঠে কন্ঠে প্রচারিত হলেও কোন বৃহৎ কর্মপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারে নি। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মানসসরোবরে ক্ষণিক তরঙ্গ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র — তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

হেমচন্দ্রের প্রথম এবং বহুল প্রচারিত দেশাত্মবোধক কবিতা হলো 'ভারত-সঙ্গীত'। 'ভারত-সঙ্গীতের প্রথম রূপ আজকের থেকে কিছু বিভিন্ন। সেই প্রথম প্রকাশিত কবিতায় ছিল শিবাজী তাঁর দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা কচ্ছেন। তখন ছিল

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
শিবাজী নয়নে হানিয়া বিজলী"

পরবর্তী রূপে হলো, "শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী।"

এই থেকে মনে হচ্ছে শিবাজীর দেশপ্রেমের মধ্য দিয়েই কবি তাঁর ক্ষুব্ধ হৃদয়কে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আছে। প্রথম অবস্থায় ছিল —

"জনক শ্বেত প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা!"

পরিবর্তিত রূপে হলো — 'জন কত শুধু প্রহরী পাহারা—এই পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছে যে বোধহয় ইংরাজদের সম্বন্ধেও তাঁর কিছু বক্তব্য ছিল। এই কবিতার জন্য এডুকেশন গেজেটের তৎকালীন সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতায় দুঃখের, আক্ষেপের অংশই বেশী। প্রাচীন শৌর্য বীর্য গৌরব আর নেই এবং সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে — ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে — এই প্রশ্নই প্রধান। ভূদেববাবু প্রথমে এ কবিতা ছাপাতে চাননি; যে দুএকটি সরকার-সম্পর্কিত কটাক্ষ আছে সেগুলির দায়িত্ব তিনি নিতে চান নি। তখন ক্ষুব্ধ হেমচন্দ্র ভারত-বিলাপ লিখলেন — যে ভারত বীরভূমি ছিল, যে ভারত প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ছিল সেই ভারত আজ ইংরাজের পদানত। 'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশে অনিচ্ছুক সম্পাদকের উদ্দেশেই বোধহয় বঙ্গেন

"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।"

ইংরাজের গর্বিত ও স্পর্ধিত ব্যবহার এবং ভারতবাসীর দুর্বল আচরণে ব্যথিত কবি, নিজেদের দুরবস্থায় খেদ প্রকাশ করে বলছেন "ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই
গোরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই।"

এই দুটি কবিতাতেই হেমচন্দ্রের কবিত্বের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো— পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন বাংলার জয়গানে যে কবিতা লিখেছিলেন হেমচন্দ্রের ভারতসঙ্গীত তারই পূর্বসূচনা। সমসাময়িক সমালোচনা এই কবিতা দুটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত। এতাবৎকাল বাংলাভাষায় এমন তেজোময়ী কবিতা লেখা হয়নি বলেই এই দুই কবিতার প্রকাশ মুহূর্তেই কবির খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু যখন দেখা যায় যে হেমচন্দ্রের প্রায় সকল খণ্ড কবিতাতেই ঐ একই সুরের পুনরাবৃত্তি চলছে তখন তার দুর্বল কল্পনাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ অসম্ভব হয়ে ওঠে।

১৮৭৫ সালে ইংরাজ যুবরাজ ভারত পরিভ্রমণে এলেন। সেই উপলক্ষে ভারতভিক্ষা কবিতা

লিখলেন হেমচন্দ্র। দুঃখিনী ভারতমাতা কুমারকে কোলে নিয়ে দুঃখ ভুলবেন এই হলো কবিতার মর্মকথা। তারপরেই ভারতের সেই অতীত গৌরব গাথা গাইতে বসলেন

"আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন
ভারতের বেদ ভারতের কথা
ভারতের বিধি ভারতের প্রথা
খুঁজিত সকলে পূজিত সকলে
ফিনিক সিরীয় য়ুনানী মণ্ডলে
ভাবিত অমূল্য মাণিক যথা।"

প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে দূরবস্থা ছিল রোমের — সে রোমও জেগে উঠলো। তারপর আবার কবি প্রাচীন ভারতে চলে গেলেন। এ সব কবিতা রসবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি কারণ ভাবের জটিলতা ও চেষ্টাকৃত উচ্ছ্বাস পাঠকচিত্তকে পদে পদে বাধা দেয়।

'কালচক্র' কবিতাতেও পূর্বগৌরব বিস্মৃত হিন্দুকে নিশ্চেষ্ট দেখে কবি আক্ষেপ করছেন। দেশপ্রেমের একই সুর এখানেও ফুটে উঠেছে। ইংরাজ চলেছে, চলেছে ফরাসী, রুষ, ইতালী; তখনই কবির আক্ষেপ

ছিল সাধ বড় মনে
ভারতও ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;

'বিন্ধ্যগিরি' কবিতা বিন্ধ্য পর্বতকে উদ্দেশ্য করে লেখা। কিন্তু নিসর্গ বর্ণনার কবিতা নয়। আজ ইংরাজ রাজত্বে ভারত জেগেছে; বিন্ধ্যপর্বত কি এখনও শুয়ে থাকবে। ইংরাজের প্রতি গভীর বশ্যতা স্বীকার করেছেন কবি —

"না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ
কে দেখাত কে শিখাত
কেবা পথে লয়ে যেত"

কবিতার উদ্ধৃতি দীর্ঘতর করে লাভ নেই। কারণ হেমচন্দ্র নতুন কথা বলেন নি—ঐ একই কথা বলেছেন। সেদিন ঘুম ভাঙ্গার মুখে ঐ গান বার বার সকলের ভাল লেগেছিল। কিন্তু সারাদিন ঘুম ভাঙ্গার গান ভাল লাগেনা। তাই আজ হেমচন্দ্র নামমাত্রে অবশিষ্ট।

হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন খুব সুখের ছিলনা। অল্পবয়সে উপার্জন করার চেষ্টা করতে হয় তাঁকে সাংসারিক অস্বচ্ছলতার জন্যে। পারিবারিক নানা অশান্তি, মোহভঙ্গ তাঁর প্রথম থেকেই ছিল; তাঁর দাম্পত্যজীবন খুব সুখের হয়নি এই কথাই জীবনীকাররা বলেছেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের করুণ পরিণতির কথা কারুরই অজানা নয়। তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে একটি নৈরাশ্য একটি ব্যর্থতার সুর কেবলই ধ্বনিত হয়েছে। আনন্দোচ্ছল প্রেমের কবিতা তাঁর নেই। প্রেম স্বীকৃতি লাভ করেনি, সে রেখে গেছে শুধু দাহ — তারই জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত প্রেমিকের চিত্ত। তাঁর 'হতাশের আক্ষেপ' 'কোন একটি পাখীর প্রতি' 'প্রিয়তমার প্রতি' প্রেমের কবিতা। 'হতাশের আক্ষেপ' সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের জীবনী লেখক অক্ষয় সরকার বলছেন "সংবাদপত্রের কবি হেমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব as one crossed in hopeless love." মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'হেমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখছেন "তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্ম উচ্চতর মহত্তর

সঙ্গীত গাহিবার নিমিত্ত এবং অনতিকাল মধ্যে 'উচ্চতানে বঙ্গপ্রাণে মিশাইয়া প্রাণ' উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলিয়া নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি' স্রোতেতে ডুবাইয়াছিলেন।" বেশী প্রেমের কবিতা তিনি লেখেন নি তাঁর প্রকাশভঙ্গী এত বস্তু-অনুগ যে গীতধর্মী প্রেমের কবিতা রচনার পক্ষে তা খুব উপযোগী ছিল মনে হয়না।

'হতাশের আক্ষেপ' এক নায়কের উক্তি। তার নায়িকা অন্যের সঙ্গে বিবাহিত হয়ে চলে গিয়েছিল, বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে এবং প্রেমিকের পদতলে পড়ে বলছে 'ছিলাম তোমারি নাথ তুমিই আমার স্বামী'। কবিতার আগাগোড়াই বুকফাটা হতাশার আক্ষেপ। আকাশের চন্দ্রোদয় স্মরণ করায় পুরোনো প্রেমের কথা। মনে বিচ্ছেদের বেদনা। কিন্তু এ বেদনা খুব গভীরতার স্তরে কবি সঞ্চারিত করতে পারেন নি। হৃদয়ের তলদেশ থেকে কোন অনুভূতির সাড়া জেগে ওঠেনি; এ মনের দুঃখ, প্রাণের দুঃখ নয়। তাই অশান্তি আছে অস্বস্তি আছে বিরহ বেদনার গাম্ভীর্য নেই—

অই শশী অইখানে এই স্থানে দুই জনে
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি!
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি!
পরে সে হইল কার এখনি কি দশা তার
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি।

সমালোচকেরা বলেছেন এ কবিতায় ইন্দ্রিয়াসক্তি নেই, প্রেমের উন্মত্ত অবস্থা নেই। সে কথা ঠিক। কিন্তু যা নেই তার জন্যে এ কবিতার মূল্য কমবেশী হতে পারে না। এ কেবল দুঃখের হাহুতাশ। একদা এই ব্যর্থ প্রেমের কবিতা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' প্রায় প্রবাদবাক্যের মত হয়েছিল। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে হেমচন্দ্র তাঁর শ্যালিকার প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি' ইত্যাদি লিখেছেন। হেমচন্দ্র যে তাঁর শ্যালিকা প্রমদার গুণমুগ্ধ ছিলেন একথা নিজেও স্বীকার করেছেন। তবে এ উল্লেখ যে তাঁরই সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা যায় না।

আর একটি ব্যর্থ প্রেমের খেদোক্তিভরা কবিতা 'প্রিয়তমার প্রতি।' যে প্রেয়সী ত্যাগ করে গেছে তার জন্য কাতর কান্না। সমস্ত সংসারে আনন্দের স্রোত চলছে অজস্র ধারায়, পৃথিবী তার বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে রেখেছে চতুর্দিকে, তার মধ্যে কবি একান্ত একেলা। এই একাকীত্ব কবিকে দুর্বল করেছে, তাঁর প্রেম নিজের মধ্যে সান্ত্বনার কোন ভরসা না পেয়ে কাঙ্গালের মত কেবলই চাইছে তার কাছে যে কিছুই দেবেনা। এ প্রেমে গৌরব নেই, মহত্ত্ব নেই—প্রত্যাখানের সামনে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে প্রেমিক তাই প্রিয়তমার কাছে করুণ মিনতি তার—

"প্রেয়সি রে মনোহরা এমন সুখের ধরা
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে!

* * * * * * *

এ সুখ সন্ধ্যায় প্রিয়ে সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে
শূন্যমনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।"

"কোন একটি পাখীর প্রতি" প্রেমের কবিতা। পাখীর ডাক শুনে কবির তাপিত মন স্নিগ্ধ হলো। তারপর সেই পাখীর ডাক শুনে মনে পড়লো পুরানো দিনের প্রিয়াকে। এই কবিতাটি অন্যান্য কবিতাগুলির তুলনায় অনেক সরল, তাই এর সহজ কথাটি পাঠককে মুগ্ধ করে। কিন্তু এই প্রেমও বলিষ্ঠ নয়। এ প্রেমের মধ্যে আত্মধিক্কার আছে যে ভুলে গেছে তাকে স্মরণ করে কবির

মনে শুধু ব্যথাই জাগেনা সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি ধিক্কারে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে—

"ধিক মোরে ভাবি তারে আবার এখন
ভুলিয়া সে নব রাগ ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন
ধিক মোরে ভাবি তারে আবার এখন।"

আবার বলছি হেমচন্দ্রের প্রেমের কবিতা একটি মাত্র মুড নিয়েই। তা হলো প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের আক্ষেপ। বলা বাহুল্য এই একটি কথা ছাড়া অন্য কোন কথা কোন কবির কাব্যে যদি না ফোটে তাহলে প্রেমের মাধুর্য, প্রেমের শক্তি বা প্রেমের বৈচিত্র্য তিনি কখনো উপলব্ধি করেন নি এই কথাই মনে হবে। বাংলা সাহিত্যে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অজস্র কবিতা আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখেছি। তাঁর 'পূরবী' 'মহুয়া' 'সানাই' প্রভৃতি গ্রন্থে বিরহের যে শক্তির লীলা তিনি দেখিয়েছেন তার সঙ্গে হেমচন্দ্র তো দূরের কথা বাংলা সাহিত্যে কোন কবিরই বা তুলনা চলে।

প্রেমের কবিতা হিসাবে উন্মাদিনীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যারা স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করছে তারা নিজেদের বন্দিনী করে রেখেছে, তাদের ভালবাসা সম্বন্ধে কবি উন্মাদিনীকে দিয়ে বলাচ্ছেন যে যারা সুখে থাকে তারা প্রণয় কি তা জানেনা। যাকে ভালবাসি তাকেই যখন পাইনি তখন অন্যের পত্নীত্বের জীবন অশ্রদ্ধেয় তাই নায়িকা বলছে

কেনই থাকিব কিসের তরে
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে।"

যদি প্রেম সার্থক হতো তাহলে ভালবাসার জন্যে নায়িকা সব ছাড়তে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তা যখন হবেনা তখন এই সংসারের আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করে নিজেকে, কি লাভ?

"ত্যাজিতাম যদি পেতাম তাহায়
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর ব্যাভার
করেছি বর্জন কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয়ে বাসনা করে।"

অবশেষে উন্মাদিনী এই মনে করে সান্ত্বনা পেয়েছে যে মৃত্যুর পরে বাঞ্ছিত প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে। প্রেমের কবিতার যে সংযম একান্ত প্রয়োজন তা কবির নেই। তাই উচ্ছ্বসিত ভাবের স্তর উত্তীর্ণ করে রসের ক্ষেত্রে এ কবিতা আমাদের পথ দেখায় না।

'অশোকতরু', 'জীবন মরীচিকা' জাতীয় কবিতা প্রেমের কবিতা নয় তবে সেই বিফল নৈরাশ্যের সুরে বাঁধা বলে তাদের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তবে এগুলিতে দুঃখ বেদনার কথা এত স্পষ্ট যে তার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা নেই। —

জায়া বন্ধু পরিবার সকলি আছে আমার
তবু এ সংসার যে বিষতুল্য কারা
মনে ভাল কেহ মোরে বাসেনা তাহারা।

'জীবন মরীচিকাও' তাই মানব জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে আক্ষেপ। তবু এখানে প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কিছু বলিষ্ঠতা আছে

'সুবর্ণ মেঘের মালা লয়ে সৌদামিনী ডালা
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে

ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে।

'জীবন সঙ্গীত' নয় 'জীবন মরীচিকা'ই তাঁর মনের কথা।

'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী' কবিতাটির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের যোগ আছে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেন। যৌবনের সুখস্বপ্নের দিন যখন চলে গেল তখন যে প্রেয়সী একদা অতি মনোরম ছিল তার আকর্ষণও ফুরালো — তখন নিজে নিজে প্রশ্ন করেন —

এই কি সে করতল শিরীষ কোমল
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল?

নারী বার বার প্রমাণ করতে চাইছে যে জীবনের কিছুই ফুরায় নি—স্বামীর দৃষ্টিকে যে মোহ দিয়ে একদিন ভুলিয়েছিল আজ সেই মোহ নতুন করে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। সে বলছে

কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।'

কিন্তু স্বামীর মন যখন আর কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছেনা তখন ছলনাময়ী নারী তার চূড়ান্ত কৌশল প্রয়োগ করেছে

তবুও উদাসী নাথ কর দোঁহে দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন
বলে তুলে আনি সুখে রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

প্রফেসর হেব্‌ল্‌রিক

আতলিয়েতে শুক্রবার একটি মহাদিন। এই দিন আসেন প্রফেসার হেব্‌ল্‌রিক, সকলের কাজ দেখে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে। সেদিন আমরা জানি, সকাল ঠিক সওয়া ন'টায় দরজাটা খুলবে একটুখানি এবং আওয়াজ আসবে 'বঁজুর মেদাম, বঁজুর মেসিয়োঁ।' বহুবচনে সকলকে প্রভাত সম্ভাষণ জানিয়ে হঠাৎ তিনি ঢুকে পড়বেন এবং সকলের চোখে পড়বে ব্রাউন্ টুইড্-এর স্যুট ও কোটের পরিপাটি সজ্জায় মাঝারি সাইজের একটি লোক—যার কেয়ারি করা গোঁফদাড়ি, উন্নত নাসা, ললাট ও দুটি জ্বল্‌জ্বলে স্বচ্ছ নীলাভ ধূসর চোখ মিলিয়ে প্রশান্ত একটি মুখ। এই চোখের চাউনিতে দেখা যেত কৌতূহল, উপেক্ষা, জিজ্ঞাসা, সহানুভূতি, বুদ্ধির জ্বৌলুষ আর অপরিচিত স্নেহ। কিন্তু কোনদিন দেখিনি সেই চোখে রাগের আগুন বা ঘৃণার অঙ্গার।

ফরাসীদের স্বভাবজাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোলানি, বলার যে ভংগি, প্রফেসার হেব্‌ল্‌রিক সেই ভাবে কথা বললেও, তাঁর বলার একটা বিশেষত্ব ছিল। মনে হত তিনি যেন আমাদের আতলিয়েকে করে দিয়েছেন এক রঙ্গমঞ্চ আর সেখানে আমরা এক একটি অভিনেতা, নায়কের হাতের একটি ভংগিমায় হয়ে গেছি মূক ও স্তব্ধ। একজনের করা মাটির মূর্তির সামনে তিনি যেই দাঁড়ালেন সকলেই অমনি তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। শ্রবণোৎসুক সকলের মুখ ফিরল তাঁর দিকে। মডেল প্লোনের দিকে হাত ঘুরিয়ে তিনি বললেন 'মাদ্‌মোয়েজেল পোজে ভু মিল্ ভু স্লে (অনুগ্রহ ক'রে ভংগিতে দাঁড়ান)। কিন্তু মডেলকে ফের দাঁড়াতে বলার সেকি ভংগিমা! মনে হলো 'গুণোর ফাউন্ড অভিনয়ে মেফিস্টোফেলিস হস্ত সঞ্চলনে আজ্ঞা দিল নর্তক ও নর্তকীদের নৃত্যারম্ভের। কেবল তফাৎ এই যে আজ্ঞাকারী মেফিস্টোফেলিসের আদেশের প্রাবল্য থাকলেও, ব্যক্তিটি পিশাচপতি নয়। তিনি যেন ক্রাইস্টের এপ্‌সোল্‌সদের একজন, ধর্মকথার গৌরচন্দ্রিকায়, বলছেন সকলকে আসন নিতে। শুনছি তাঁর কথা—'বাহা বেশ করেছ। কিন্তু তোমার মূর্তির রং ঠিক হয়নি।' ভাস্কর্যের মূর্তির রং। শ্বেত পাথরের সাদা, ব্রোঞ্জের কাল্‌চে, তামা আর মাটির ধোঁয়াটে কালো রং, তা তো পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু প্রফেসার এই একরঙা মূর্তিতে দেখতে বলছেন রুন্ড বুনেট ও নিগ্রোর অন্য বর্ণের তারতম্য! বোঝালেন তিনি, এই একরঙা মাটি, পাথর বা ধাতুতে ভাস্কর দেখাতে পারে সব রং, যদি তার মন আর চোখ কেবল গঠনের প্রতি নিবিষ্ট না হয়। মূর্তির গায়ে গঠনকৌশলে, আলোকের আচ্ছাদনে, শোষণে ও বিচ্ছুরণে, ছায়ার সংগে কানামাছি খেলে ভাস্কর ধরে ফেলে সব কটা রং। এই রঙের খেলা জানত গ্রীসের ভাস্করেরা। যাদের দেবদেবীরা দৌড়ঝাঁপ করত ব্যায়ামশালায় বা স্নানাগারে। তাই তাদের করা পাথরের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে। এক রঙা বস্তুর ওপর চড়ে যায় সুষ্ঠু দেহের রক্তিমা, দুলে উঠে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবনের স্পন্দন। রোমানদের না ছিল উন্মুক্ত ব্যায়ামশালা বা সার্বজনীন স্নানাগার, যেখানে হ'তে পারত সুগঠিত নগ্নদেহের সমারোহ। তারা এই সজীব নগ্নতার প্রদর্শনীকে মনে করত অশ্লীলতা। তাই তাদের রূপকারদের রচনার সাহায্যে দাঁড়াত না নগ্ন, জীবন্ত মানুষ। গ্রীসীয় ভাস্কর্যের নগ্নমূর্তি সহায়তা করত, রোমক ভাস্করের মূর্তি গঠনে।

তাই তারা পেল শুধু পাথর আর ব্রোঞ্জ। উবে গেল তাদের করা মূর্তি থেকে জীবন ও সজীব ত্বকের উষ্ণতা। মানুষের গঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরেট পাথরগুলি ও ধাতুময় অবয়ব।

প্রফেসার হেব্‌ল্‌রিকের প্রশংসায় মন ভ'রে গেছে গর্বে, প্রাণ ভ'রেছে সাফল্যে। হঠাৎ বেজে বেজে উঠল বেসুর—রং, তো বেশ, কিন্তু তোমার মূর্তি দাঁড়িয়েছে বেসামাল। নিলেন তিনি একটা ছুরি। তার তীক্ষ্ণ ফলা কেটে চলল মূর্তির মাঝ দিয়ে, যেখানে হওয়া উচিত ছিল সংগতির মধ্য রেখা। কাঁধটি মাপের অধিক হওয়ায়, তাঁর হাতের ছুরি কেটে চলল কাঁধ আর হাত। এইভাবে যখন তাঁর বক্তব্য হ'ল শেষ—পড়ে রইল মূর্তির ছিন্ন অপ্রাবশেষের স্তূপ, আর যে গড়ছিল সেই মূর্তি তার পুঞ্জীভূত হতাশা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে আমরা মাটিতে গ'ড়ে চলি, মডেলকে সামনে রেখে মূর্তি। আর যখন সে মূর্তি হয় পরিপূর্ণ, প্রফেসার হেব্‌ল্‌রিক এসে, প্রথমেই দেন কিছু কৃতিত্বের প্রশংসা এবং পরে অসংখ্য ভ্রান্তির বেদ। মূর্তিকে ভেঙে মাটির স্তূপে পরিণত করে বলতেন তিনি 'ফের সুরু কর। এর পরে ঠিক মত গড়তে পারবে।' মোলায়েম সেই উপদেশ যেন বলির মহিষের গলায় সাদরে ঘি মালিশ। এইভাবে ভেঙেছেন তিনি আমার তিন চারটি মূর্তি। এর পরের মূর্তিটি পেল ভুলের দীর্ঘ তালিকার চেয়ে সাফলোর বহু প্রশস্তি। কিন্তু সেটাও তাঁর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেল না। হলো খুব রাগ। বলে ফেললাম 'মসিয়োঁ মা' প্রফেসার, আজকে আপনার আতলিয়েতে বলা কওয়া শেষ হ'লে, আপনার সংগে দেখা ক'রে ক'টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?' আমার গলার আওয়াজে হয়তো ছিল খানিকটা রাগ ও ক্ষোভের সুর তাই একটু ইতস্ততঃ ক'রে শান্তস্বরে বললেন 'নিশ্চয়ই।'

সি'য়াসের শেষে গেলাম তাঁর ঘরে। তিনি সাদরে বললেন 'বসো'। বললাম 'না, আমার যা বক্তব্য তা দাঁড়িয়েই বলতে চাই। মঁসিয়ো হেব্‌ল্‌রিক আপনিও একদিন আমাদের মতো ছাত্র ছিলেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আপনার শিক্ষক, আপনার মতো নির্মমভাবে ভাঙতেন তাঁর ছাত্রদের প্রাণভরে গড়া কাজ। তা যদি হ'ত তাহলে আপনি জানতেন আমাদের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ এবং যদিও আমাদের হৃদয় দিয়ে গড়া এই মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, তবুও এগুলিকে ভাঙতে আপনার হাত হয়ত ইতস্ততঃ করত। ভুলভ্রান্তি থাকলেও আমাদের মূর্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখায় আপত্তি কিসের?' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি ব'লে ফেললাম এবং তাঁর ভর্ৎসনার অপেক্ষমান হ'য়ে, চাইলাম তাঁর দিকে। দেখলাম তিনি হাসছেন। ভাবলাম এ বিদ্রূপের হাসি। হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে তিনি বললেন 'ঠিকই বলেছ, আমার যিনি প্রফেসার ছিলেন তিনি আমার ছাত্রজীবনের কাজগুলিকে এমন ক'রে ভাঙেননি। কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাঁর কাছ থেকে আমি এ অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়েছি। ভাবছ, আমি বাজে বক্‌ছি। মনে রেখ, এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ফ্রান্সের বিরাট ভাস্কর-রথীরা। বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোঁদ্যার শিষ্য বিখ্যাত বুর্দেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই একাডেমীর। সেই বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বুর্দেলের ছাত্র আমি আর তোমরা হচ্ছ আমার ছাত্র। আমার আকাঙ্ক্ষা যে তোমরা সকলেই হবে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। কিন্তু বড় হওয়ার দায়িত্ব অনেক। লব্ধ প্রতিষ্ঠ হলেই আর তোমার নিজের বলতে কিছু থাকবে না, গুণমুগ্ধজন টেনে আনবে তোমার গোপন ও অগোপনকে। তোমার সাফল্যে ভরা কাজের পাশে দাঁড় করিয়ে দেবে তোমার বাঁচিয়ে রাখা অপরিণত অসম্পূর্ণ কাজগুলি। তখন হবে তুমি অপ্রস্তুত ও লাঞ্ছিত। তাই আমি তোমার এই ভ্রান্তি ভরা মূর্তিগুলিকে ভেঙে, ভবিষ্যতের লজ্জা থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস করছি মাত্র। ঘাড় হেঁট করে চলে এলাম আতলিয়েতে, কৌতূহলী সকলের

দৃষ্টি আমার প্রতি। কিন্তু তারা কেউ জানল না যে প্রফেসার হেন্‌রিক ঐ এক কথায় করে-দিয়েছেন আমার অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

প্রফেসার হেন্‌রিক, তিনি 'লিজিওঁদোনর্‌' সম্মানে ভূষিত হওয়ায় যে তাঁর চালচলনে একটা সম্ভ্রান্তের বৈশিষ্ট্য এসেছিল, তা নয়। তাঁকে দেখলে বেশ বোঝা যেত যে তিনি আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে জন্মেছিলেন। মডেলকে উদ্দেশ্য করে যখন তিনি কিছু বলতেন, তখন মনে হত তিনি যেন একটা সাধারণ নগ্না নারীকে সম্বোধন করছেন না, সে যেন বেদীতে আসীনা দেবী আর তিনি রূপার্চনার পুরোহিত। এ শুধু আতলিয়েতে নয়, ক্যাফেতে বসে থাকাকালীন তাঁকে, কতবার উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে দেখেছি পথচারিণী কোন চেনা মডেলকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেককে তাঁর এই ব্যবহারকে শিষ্টাচারের আধিক্য বলে ঠাট্টা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি জানতাম ঐ আদব ছাড়া যে শিষ্টাচার অন্যপ্রকার হতে পারে এজ্ঞান তাঁর ছিল না। মনে পড়ে, যুদ্ধারম্ভে যখন গিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে, তিনি আমার দু'টি হাত ধ'রে আমার চোখের উপর তাঁর স্থির দৃষ্টি ফেলে সেই অভিনয়ের ভঙ্গিমায় বললেন, 'বন্ধু তুমি নিজের দেশে ফিরছ, তোমাকে এখানে থাকতে বলার দাবী আমার নেই। ফ্রান্স আজ বিপন্না। জানি না ফ্রান্স এই মহা-সংগ্রামের পর বেঁচে থাকবে কিনা। তুমি যেখানেই যাও নিয়ে যেও সঙ্গে করে ফ্রান্সের খানিকটা প্রতীক। ভুলে যেও না রোঁদ্যা ছিলেন এক বিরাট ভাস্কর। তাঁর শিষ্য বুর্দেল ছিলেন তাঁরই সমান মহাশিল্পী। আমার ছাত্র হিসাবে তুমি তাঁর প্রশিষ্য। ভুলো না বন্ধু তোমার প্রফেসার হেন্‌রিককে, তাঁর গুরু বুর্দেল ও বুর্দেলের শিক্ষক রোঁদ্যাকে। ক'র না অমর্যাদা আমাদের শিক্ষার ও ফ্রান্সের ঐতিহ্যের। ব'ল না বিদায়। আমি এখনি উঠে ফিরে দাঁড়াব, তুমি নিঃশব্দে চ'লে যেও।'

১৯৪২শে অনেক ঘুরে কার পাঠিয়ে দেওয়া ফরাসী সংবাদপত্রের একটি কাটিং হাতে পেঁছল। তাতে লেখা ছিল—'অকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুঃখে মর্মাহত হেন্‌রিক কয়েকদিনের রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।'

মার্থের মডেলিং ষ্ট্যান্ড ঠিক আমার পাশেই। পরের শুক্রবার যখন প্রফেসার হেন্‌রিক এলেন এবং তার করা মূর্তির বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন মার্থ তার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে বল্‌লে 'মসিয়োঁ হেন্‌রিক, আপনি মূর্তিটার ভুল বলে যান আর আমি যেখানে যেটা কেটে ফেলা প্রয়োজন তা কাটতে সুরু করি।' তিনি আঙুল দিয়ে যেমন ভুল দেখাতে লাগলেন মার্থও যেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে মূর্তির সেই অংশগুলিকে কাটতে লাগল এবং প্রফেসারের বলা শেষ হলে যখন পড়ে রইল ভাঙা মাটির স্তূপ—গুলিমারা প্রাণদণ্ডিতকে যেমন শেষ গুলির কুৎদ্য গ্রা দেওয়া হয় তেমনি ছুরিটা সে সজোরে সেইস্তূপে হাতল পর্যন্ত মেরে বসিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। পৈশাচিক সে হাসি। মনে হল সে যেন জেনে ফেলেছিল মসিয়োঁ হেন্‌রিকের সঙ্গে আমার রাগের অভিনয়টুকু এবং তারই একটা পরিহাস সে এই সুযোগে করে নিল। সবাই যখন চলে গেছে সে আর আমি একা রয়ে গেছি। মার্থ বল্‌ল 'ওহে অভিমানী মূর্তিটা আমি কাটলাম তোমাকে আঘাত দিতে নয়, প্রফেসারের খুঁতিটাকে একটু খুলিয়ে দিতে। আমি তার হেঁয়ালি ঠিক বুঝলাম না। সে বলে চল্‌ল 'তোমার দগ্ধ মরমের জ্বালাকে যদি শান্ত করতে চাও তো চলো আমার সঙ্গে প্লেইয়েলএ। আমার কাছে দু'খানা বিনি পয়সার টিকিট আছে। চলো বাখ্‌-এর কোরাল শুনে আসি।' আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললে—

'ও ভুলে গেছি, তোমাদের সেই পোঁ-ধরা প্রাচ্য সঙ্গীত শুনে অভ্যেস, আমাদের সঙ্গীতের ঝঞ্ঝা রবে তোমাদের কানের পাতলা পর্দা হয়ত ছিঁড়ে যেতে পারে।' ভাবলাম স্রষ্টা মার্থের জিবটা ভুলে দিয়েছে। ওটা ওর হাতের ছুরিখানা হলে ঠিক হত। তার নিমন্ত্রণ—না নেওয়ায় আরও অপদস্ত হতে পারি ভেবে বললাম 'না মাদ্‌মোয়েজেল আমাদের কানের পর্দাটা পাতলা নয় মোলায়েম, যার ওপর সুর লুটোপুটি খেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না। তোমাদের কানের পর্দা মনে হয় অনেক গভীর খাদ আর চড়ায়ে ভরা। সেখানে সুর ছুটোছুটি করে পড়ে খায় আছাড়, ডিগবাজী আর করে আর্তনাদ। হঠাৎ দুজনেই বুঝলাম এনিয়ে বেশি বচসা করলে হয়ে যাবে রাগ ও ঝগড়া কাজেই এইখানেই সন্ধি করে আমরা চললাম সাল্‌প্লেইয়েলে।

সিঁড়ি বেয়ে ভেস্‌টিবিউলের মধ্যে চলেছে শ্রাবকের দল, বেশির ভাগই কালো সান্ধ্যসজ্জায় ফিট্‌ফাট্‌। নিজের টুইড্‌ জ্যাকেট ও ধূসর ট্রাউজারের দিকে তাকিয়ে প্রায় অপ্রস্তুত মনে করার আগেই মার্থ বল্‌লে 'ভয় নেই হে। আমরা বসব গ্যালারিতে। সেখানে টুইড্‌ জ্যাকেট কারও আভিজাত্যের স্নায়ুতে ঘা দিয়ে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করবে না। স্যালপ্লেইয়েল প্যারীর প্রায় সব চেয়েও সেরা সংগীত-ভবন। বিখ্যাত সংগীত সুরবিদ্‌ হাইডেনের ছাত্র ইগ্‌নাৎস্‌ জোসেফ প্লেইএল্‌ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার এক কম্পোজার। তিনি প্যারীতে এসে বসবাস করেন এবং বিখ্যাত সংগীতকারদের রচনা ছাপিয়ে ও পিয়ানো বাজানোর শিক্ষকতা করে বেশ সুনাম অর্জন করে-ছিলেন। আজও তার প্রতিষ্ঠিত পিয়ানো তৈরীর বিপণি প্যারীতে বর্তমান। তারই নাম বহন করে আসছে এই সুবিখ্যাত সুর-মন্দির—যেখানে কত খ্যাতনামা ও সেরা সুরকুশলীদের সংগীত সুরবাদ্যের সঙ্গতের প্রীতি ও মুগ্ধ শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি এর দেওয়ালগুলিতে আছড়ে শিল্পী প্রাণে তুলেছে আনন্দের জোয়ার।

সিঁড়ি ভেঙে কয়েক তলা উঠে যখন গ্যালারিতে আমাদের আসন নিয়ে, নীচে সংগীত-মঞ্চের দিকে তাকালাম তখন দূরত্বের ব্যবধানে ও পারিপার্শ্বিকে কেবল বাদ্যকরদের টাক মাথা ও ঝক্‌ঝকে ভায়োলিন, চেলো, ভিয়োলো, ফ্লুট্‌ ও ক্লাভি-কর্ডএর হাইলাইট সবচেয়ে ও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। উজ্জ্বল, মসৃণ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে যেন দেখা যায় বেশীর ভাগই বাদ্যকরদের কেশবিহীন মসৃণ মস্তক। যন্ত্রশিল্পীরা স্ব স্ব যন্ত্রকে টুং, টাং, পিপ্‌, পোঁ, ভোঁ প্রভৃতি শব্দে সুরস্থ করছিলেন এবং তার সঙ্গে জনতার গুঞ্জন ধ্বনি মিশে আসন্ন সংগীত সম্ভাবনার এক আবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে কার আগমনে করতালি বেজে উঠল। আস্তে আমার কানে কানে মার্থ, বল্‌ল 'উনি হলেন শ্যেফ্‌ দ্য অর্কেস্ত অর্থাৎ বাদ্যকার-দের মুখ্য। তারপরেই এলেন কন্‌ডাক্‌টর—বাদ্যবাদনের অধিনায়ক। আবার করতালি ধ্বনির একটা উচ্ছ্বাস উঠল। বাদ্যবাদনের অধিনায়ক একবার শ্রোতাদের দিকে ফিরে আবক্ষ মাথা নীচে ঝাঁকিয়ে সকলকে অভিবাদনান্তে ফিরে দাঁড়ালেন মঞ্চের বাদ্যকারদের দিকে। তাঁর হাত দুখানা উঁচু হতেই সমস্ত হলটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর মৃদু হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হ'তে যেন ধীরে ভেসে এল সংগীতের ঝর্ণাধারা। প্রথমার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাখ্‌-এর ফিউগ্‌ রচনা। কনট্রাপানটিভ বাদ্য সংগীতকে ভাল করে বুঝে উপভোগ করতে গেলে কিছুকাল এই ধরণের রচনা শুনে শুনে কানকে অভ্যস্ত করার প্রয়োজন। অনভ্যস্ত আমার পক্ষে এই প্রথম ফিউগ রচনা কানের সঙ্গে লাগল বিবাদ। মনে হ'ল বহুবিধ যন্ত্রের বেখাপ্‌পা আওয়াজ অযথা দৌড় ঝাঁপ করে একটা সুরের হট্টগোল লাগিয়েছে। অথচ মনে মাঝে মাঝে এই শব্দের জঙ্গল বদ্‌লে হয়ে যাচ্ছিল সাজান সুরের উদ্যান। প্রথমার্ধের প্রোগ্রামান্তে বিরাম সুরু হলে মার্থ জিজ্ঞাসা করলো 'কি হে, এ মিউজিক সহ্য হচ্ছে, না কানে চোট লেগে আহত হ'লে?

সত্যি না ব'লে উত্তর দিলাম 'না, না, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু মার্থকে সত্যি বা মিথ্যে কোনটা বলে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল। সে বললে ' কি ভালো লাগল, কেন ভাল লাগল, বলো।' বলতে হ'লো মামুলি কথা 'চিনি খেয়ে মিষ্টি লাগলে ভাষায় কি বোঝাতে পারো মিষ্টি লাগা কি?' কিন্তু তাকে কি অত সহজে নিরস্ত করা যায়? তার জবাব এলো 'বেশ তো, মিষ্টি না হয় নাই বোঝাতে পারলে কিন্তু চিনি কি বস্তু, তার রং কেমন, চেহারা কেমন, সেটা তো বলতে পারো। বললাম কন্‌সার্ট শেষ হ'লে বলব আমার বাখ্ কেমন লাগল। অপরার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাখ্-এর প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চারতোর একটি রচনা। এইবার এই সংগীত ধারায় বেজে উঠল আমার কানে অশ্রুতপূর্ব এক অপূর্ব সুরের ছন্দ। ভায়োলিন সুরের পদগুলিকে যেন জমাট জিনিসের মত একের উপরে অন্যকে সাজিয়ে তৈরী করতে লাগল সংগীতের ইমারত এবং সুরের সোপান বেয়ে অনায়াসে সেই ইমারতের উপরতলা ও নীচ তলায় কান আনাগোনা করতে লাগল। প্রোগ্রাম শেষ হলে উত্তেজিত করতালির ফলে গরম আরম্ভ হাতে যখন মার্থের করমর্দনে বিদায় নিলাম এবং তাকে বললাম 'জানতে চেয়েছিলে বাখ্ শুনে কি রকম লাগল? তোমার বাখ্ সুরের স্তবকের উপর স্তবক দিয়ে গড়ছিলেন তাঁর সুর মন্দির আর আমার সবখানি দিয়ে যেন সেই মন্দিরের সারা ধাপে চড়ে নৃত্য করে এলাম।' সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল 'তোমাদের সুর বোধ সম্বন্ধে যে বাঙ্গোক্তি করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই বাখ্ আগে শুনেছিলে এবং তাঁর সংগীত সম্বন্ধে বেশ কিছু জান। বললাম 'না মাদ্‌মায়জেল্, বাখ্-এর সংগে পরিচয় এই প্রথম। তার সম্বন্ধে জানবার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কোনদিন সময় করে যদি বল, তাহলে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সংগে শুনব।'

যুগ-মানস

সনৎকুমার রায় চৌধুরী

গত পঁচিশ বছর থেকে আমরা এই কথাই বারবার শুনে আসছি যে বর্তমান যুগ এক চরম সঙ্কটের ঘূর্ণী হাওয়াতে বয়ে চলেছে। তিরিশের অর্থসঙ্কটের জের টেনে আমরা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী লড়াইএর আগুনের মুখে এসে পড়লুম। লড়াইএর দাবানল থেকে যারা বেঁচে উঠল তাঁদের ও রেহাই নেই, তারা সঙ্কটের আবর্তে যথারীতি তরঙ্গাহত হয়ে কালস্রোতে ভেসে চলেছে। আজ এমন একটি যুগের আঙিনায় বাস করছি যেখানে চোখ মেলেই শুধু ভেসে ওঠে ভাঙনের স্রোত। আন্তর্জাতিক বা জাতীয় শক্তি খণ্ড খণ্ড শিবিরে বিভক্ত। সামাজিক জীবন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে খণ্ডিত। একান্নবর্তী পরিবার ক্রমশঃ টুকরো টুকরো হতে চলেছে। চারিদিকে সব কিছু ভাঙছে, কিন্তুই দানা বাঁধছেনা। আজ ভাঙতে ভাঙতে মানুষ একাকী, নিঃসঙ্গ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নির্জন কোণে এসে দাঁড়িয়েছে।

যুগ আদর্শ বিচার করলে মানুষ আজ তার পরিবার, পল্লী দেশ ও জাতির সবার সীমানা ছাড়িয়ে সারাবিশ্বের সাথে মেলাবার জন্য এগিয়ে চলছে। আরেকদিকে লক্ষ লক্ষ লোক আজ গৃহছাড়া, দেশছাড়া, পারিবারিক জীবনথেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ব্যক্তিজীবনের সঙ্কীর্ণ সীমানাকে সুরক্ষিত করবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। ভাই চেনেনা ভাইকে, সবাই খোঁজে ভাই। বর্তমান মানুষ আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজ সবচেয়ে উদারপন্থী আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন মনে হয়, অপরদিকে বাস্তবক্ষেত্রে মানুষ আজ হয়েছে অতিমাত্রায় স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মরতিতে দিনরাত ভরপুর। এই দ্বন্দ্ব বর্তমান সভ্যতার অন্তরালে আপনাকে তীব্রভাবে প্রকাশ করছে। পিতা পুত্র, ভাই বোন সামাজিক বন্ধন একে একে খসে পড়ছে কারুর সাথে কারুর অন্তরের যোগ নেই অথচ প্রতিদিন সভাসমিতে হাজার হাজার লোক। কাতারে কাতারে একসাথে চলবার চেষ্টা করছে। ঘরের আবহাওয়া থেকে ক্লাব, সমিতি বা আড্ডার হৈ হল্লার ভিতরে আমরা মনের আরাম খুঁজে মরি। আড্ডা জনসাঁদোলন আমাদের ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট সুখ ও দুঃখ ভুলিয়ে নৈর্ব্যক্তিক বৃহত্তর জগতের সাথে সংযোগ করে দেয়। "The mass-movements of our age are by no means the only signal manifestations of this craving for comradeship" (Paul Halmos: Solitude and Privacy).

একদিকে মানুষ ক্রমশঃ বিকেন্দ্রীভূত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অপরদিকে তার অন্তরের রিক্ততা শূন্যতাবোধ তাকে সবার সাথে সুর মেলাবার জন্য অধীর করে তুলছে।

আজ পরিবারবর্গ বা পল্লীর কারুর সুসংবাদ আমাদের মনকে আনন্দে দোলায়িত করার থেকে বরং অকারণ ঈর্ষা বা বিদ্বেষ সঞ্চার করছে। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু বা বিয়োগ ব্যথা, দুঃখ বেদনা আমাদের মনকে পূর্বের মতন গভীরভাবে নাড়া দেয় না। গভীর বেদনাবোধ সূক্ষ্ম মনের আবেগ যান্ত্রিক আবেষ্টনীতে স্তিমিত, প্রায় অবলুপ্ত। আজ আমরা পৃথিবীর মতন চিরউদাসীন নির্মম। নীরব দ্রষ্টার মতন সব শুধু দেখে যাই।

"And now you live dispersed on ribbon roads,
And no man knows or cares who is his neighbour . . . .
(Eliot: The Rock)

বড়ো কিছু করবার পিছনে যে প্রাণের আবেগ, প্রবল উন্মাদনা প্রয়োজন আজ শুষ্ক বুদ্ধির হলকর্ষণে ও যান্ত্রিক উপায়ে তার অভাব মেটেনা। সুস্থ প্রাণের দাবীকে অস্বীকার করে শুধু-মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, গাণিতিক নিয়মে সমাজ ও সভ্যতার ধারা বয়ে চলে না। বর্তমান বুদ্ধিজীবিদের চোখ ঘোলাটে, বিকৃত। অসহায় দৃষ্টিতে নিজেকে ও সবাইকে দেখছে। ভাবের বেসাতি নিয়ে আপন রচিত জালে নিজেরা জড়িয়ে রয়েছে। ভাবের সাথে কাজের কোন সংযোগ নেই। ভাব নিতা আকাশ বিহারী অথবা কল্পনার রঙিনক্ষেত্রে চাষ করছে, দৈনন্দিন কাজ চালিত হচ্ছে জৈব জীবনের অন্ধ প্রবৃত্তির শাসনে। আমাদের জীবনের বেশীরভাগ অচেতন, অন্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বর্তমান আলোতে ঝলমল সভ্যতার অন্তরালে সমাজের আঁধারঘেরা স্তরগুলির দিকে চোখ মেলেই এই রূঢ় সত্য প্রতিভাত হবে। আদিম জগতের নিষ্ঠুর বর্বরতা, রক্তে মাতাল পাশবিক শক্তি, নগ্ন কামপ্রবণতা ও যৌন প্রবৃত্তি সভ্যতার চারিপাশে সসম্মানে বিরাজ করছে। নীতি টিমটিম জ্বলছে গুটিকয়েক বিবেকী, অমিত বীর্যবান, ত্যাগী পুরুষের হৃদয়গহনে। তারাও বেশীরভাগ শুধু ভাল মানুষ সেজে নিজেদের বিবেকের আগুনে নিজেরা জ্বলছেন বা পুড়ছেন বাইরের আঁধার রাশিকে ভেদ করবার অদম্য ইচ্ছাশক্তি বা প্রেরণা তাদের নেই। সমাজের দৈবী-শক্তি নিষ্ক্রিয়, শুধুমাত্র নীতির দোহাই বা বর্তমান সভ্যতাকে অভিশাপ দিয়ে তারা এককোণে বসে থাকেন। লড়বার জন্য এগিয়ে আসেন না। এই দিকে এরাও দুর্বল, মৃতপ্রায়। অপরদিকে সমাজবিরোধী বা দানবিক শক্তি আজ অধিকতর সক্রিয়, ভয় ও হিংস্র অস্ত্র নিয়ে সমাজের সুস্থ আবহাওয়াকে কলুষিত করছে।

সাধারণ মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ছোট ছোট লোভ, স্বার্থের বেড়াজালে নিজেকে বেঁধে রাখছে। ব্যক্তি জীবনের ছোট সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর জীবনে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে জীবনকে সেই সুরে বা ভাবে নিজেকে বেঁধে তোলা আধুনিক মানুষকে পূর্বের মতন অনুপ্রাণিত করেনা। আধুনিক মানুষ সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে ছাড়িয়ে এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্রের পক্ষান্তরে স্বামী বা মেয়ের দিকে দেখবার বা ভাববার অবকাশ বা ইচ্ছে ক্রমশঃ ভাটা পড়ছে। নিজের রঙ্গীন কামনা, আশা ও ভরসা, স্বপ্ন পারাবারে অবিরত ভেসে যাওয়া হোল এদের জীবনের মূল সুর। মাঝে মাঝে মনে হবে কারুর সাথে মনের সুর মিলছেনা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী, দেশের লোক সবার থেকে দূরে আসবার জন্য মন ছট্‌পট্‌ করছে। নিরিবিলি, নিঃসঙ্গ, নির্জন কোণে কালাতিপাত করার জন্য মন প্রায় ব্যগ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের নির্জনতা প্রীতি আসছে অবসাদ, নৈরাশ্য ও পলায়নবৃত্তি থেকে। প্রকৃতপক্ষে যথে জীবন, সম্পাকামনা ও সামাজিক জীবনে নানা উৎসব অনুষ্ঠান ক্রীড়াকলাপে যোগদান করবার প্রবল ইচ্ছা প্রতিনিয়ত পীড়ন করছে। একদিকে অবসাদে, শ্রান্তিতে নুইয়ে পড়ে পালিয়ে যাবার জন্য মনডানা মেলে রয়েছে কিন্তু সঙ্গীহীন অনন্ত অম্বরে ভেসে যাবার জন্য মন তৈরী নয়। আধুনিক মানুষ মনে প্রাণে এক বিরাট শূন্যতা ও রিক্ততা অনুভব করছে। পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে এই শূন্যতার এক অংশ পূর্ণ করতে সে বারবার বিফল হচ্ছে। নির্জনতার প্রতি তার মোহ ও ভয় দুই পাশাপাশি বিরাজ করছে। নির্জনতার ভিতর আমাদের খণ্ডিত জীবন মাঝে মাঝে স্থিতধীঃ হয়ে নিজেকে খুঁজে অথবা তার ভারসাম্য ফিরে পায় তা নাহলে শুধু নাগরদোলার মত শুধু সারা-জীবন ঘুরে মরতে হয়। আধুনিক মন যে নির্জনতা কামনা করছে সেটা তার গভীরতম হৃদয়স্থল থেকে উৎসারিত নয়। এই বিরাট সংসারে নানা আঘাতে যখন মন মরিয়া হয়ে ওঠে, প্রতিযোগিতায়

পিছু হাটতে শুরু করে তখন অবসাদ ম্লানিতে ভরা জীবন একটু নির্জনতার কামনা করে। এর পিছনে রয়েছে পরাজয় মনোবৃত্তি (defeatism) অবক্ষয় (Frustration) ও নৈরাশ্য (Despair)। আধুনিক মন এতো হাল্কা, ও পল্‌কা সে অল্পতে নুইয়ে পড়ে, জীবনকে গভীর ও সমগ্রভাবে দেখবার অসীম ধৈর্য ও সাহস তার নেই।

ব্যক্তি জীবনে এই আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও গভীর নৈরাশ্য আজ যে তীব্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তার প্রধান কারণ হোল সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন ভাঙ্গন। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ঘরকে সদাসর্বদা পাকা করবার ফন্দী হয়েছে আমাদের একমাত্র ধর্ম। বর্তমান সমাজে মানবিক মূল্য বা মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ গৌন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেশাগত, বুদ্ধিগত, অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনে যতটুকু পরস্পরের যোগাযোগ সম্ভবপর ততটুকু নিয়ে সামাজিক জীবন গড়ে উঠছে। To day human relations are throughout superficial and not fundamental. (Trigant Burrow). সমাজের বিভিন্নস্তরের লোক নিজেদের ছোট ছোট গন্ডী করে তার ভিতরে নিজেদের বেঁধে রাখছে। সম্মুখে জনস্রোত বয়ে চলছে তার সাথে আমরা নিজেদের ছোট গন্ডী ছেড়ে মাঝে মাঝে ভেসে যাই। বেশীরভাগক্ষেত্রে থাকেনা আমাদের ঐকান্তিকতা, মানবতাবোধ ও আদর্শনিষ্ঠা। দল, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা সব নির্ভর করছে সংখ্যার উপর, আদর্শ বা নীতির উপর নয়। আদর্শ সে শুধু আমাদের ভাবের বিলাস, নীতি সে শুধু আমাদের ফতোয়া, যান্ত্রিক উপায়ে অচেতন জনগণকে শুধু নিজেদের খোয়াড়ে ঢোকাতে পারলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি। সভ্যতার পুরোভাগে ইউরোপের যে দেশগুলি রয়েছে তার শোচনীয় পরিণাম দেখলেই এই কথা আরও স্পষ্টতর হবে। ক্যাণ্ট, হেগেলের দেশ জার্ম্মানী, গায়টের জন্মভূমি জার্ম্মানীতে কি করে লক্ষ লক্ষ লোক অন্ধ বধির হয়ে হিটলারের দানবিক শক্তির কাছে মাথা অবনত কোরল তার ইতিহাস আমাদের মন থেকে দূরে সরে যায়নি। একই যান্ত্রিক ও নৃশংস পথ অনুসরণ করে নভেম্বর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় যেইখানে প্রথম মজুর রাষ্ট্রের উদ্ভব হোল সেইখানে ধীরে ধীরে ষ্ট্যালিন আমলাতন্ত্র স্বৈরাচার কায়েম কোরল, হাজার হাজার লোককে বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে নিজের দলকে মজবুত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এই যান্ত্রিক উন্মাদনার পায়ে হাজার হাজার লোক তাদের আদর্শ, নীতি-বুদ্ধি, বিদ্যে সব আত্ম-নিবেদন করছে।

দল, গোষ্ঠী, সংস্থা সবার পিছনে রয়েছে সচেতন প্রচেষ্টা, মানবিকবোধ, সামাজিক চেতনা ঐকান্তিকতা। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, কথার সাথে একটু ঘর্ম ঝরবে, জলের সাথে মেশাতে হবে রক্তের কণা, তবে কথায় ফল ফলবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের দেয়ালে বারবার করতে হবে আঘাত, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত আদর্শের সাথে সুর মিলিয়ে জীবন করতে হবে রূপান্তরিত। আজ ঘরে বাইরে সর্বত্র আমাদের বেশীর ভাগ ফাঁকির উপর চলছে। আমরা শুধু বাইরের জনতাকে ফাঁকি দিচ্ছিনা, আদর্শের নাম করে নিজেদেরও ফাঁকি দিচ্ছি। প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের ক্ষণের তরে মিলছে আবার সেই প্রয়োজন ফুরোলে আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হচ্ছে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমাজের কাঠামো গড়ে ওঠে সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলে শুধু প্রয়োজনের মানদণ্ডের উপর সামাজিক জীবনের সকল অঙ্গ বিচার্য নয়, আমাদের জীবন শুধুমাত্র প্রয়োজনের সীমানাতে সীমিত নয়, তার ব্যাপ্তি ব্যাপকতর, দূর দিগন্ত প্রসারী। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের মনও জীবনের পরিধি ক্রমশঃ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জগতের দিকে প্রসার করছে, দর্শন ও সাহিত্য আমাদের মনকে ভৌগোলিক ও জাতির গন্ডী ছাড়িয়ে এক বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের সাধারণ জীবনধারা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে।

একথা নিদারুণ সত্য যে অন্নচিন্তা ভয়ংকরা, তাকে বাদ দিয়ে আজ কোন চিন্তা মনে রস যোগাবেনা। এই অন্নচিন্তার চিরন্তন সমাধান ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে কখনও সম্ভব নয়। এটা সামাজিক সমস্যা, লক্ষলক্ষ লোকের ঐকান্তিক সাধনা, তিলে তিলে আত্মত্যাগ, দীর্ঘদিনের সামাজিক বিপ্লবের পথে এর সমাধান সম্ভবপর। অন্নচিন্তা সমাধানের সাথে সাথে আমাদের কল্পিত মানবিক ভিত্তিতে সমাজের বনেদ রাতারাতি গড়ে উঠবেনা। অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মানব সভ্যতা নির্ভরশীল হলেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানব জীবনের রূপান্তর ঘটবে এরকম ভাবা অনেকটা ছকে বাধা অথবা যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত জগতে চলতে পারে। ইতিহাসের গতি আপন নির্ধারিত পথ ধরে যন্ত্রের তালে এগিয়ে চলেনা। আজ আমরা ইতিহাসের স্রোতে অসহায়ের মত ভেসে চলেছি, এক অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারের দিকে ধেয়ে চলেছি। আমরা যদি Fatalism দর্শনের অনুবাহক হয়ে সব ভাগ্য বা কালস্রোতের ওপর সব ছেড়ে দিই তবে আমাদের যথারীতি মরণের কোলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি ব্যক্তিসীমানা ছাড়িয়ে সচেতন হয়ে শুভবুদ্ধি নিয়ে সামাজিক জীবনে অগণিত লোকের সাথে হাত মিলিয়ে চলতে পারি তবে আমাদের দুর্বার সংঘশক্তি, বৈপ্লবিক চেতনা ইতিহাসের স্রোতের মোড় ঘোরাতে ও নতুন ইতিহাস সৃজন করতে পারে। সুস্থ পরিবেশ আমাদের বর্তমান জীবনের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে এক উজ্জ্বল, সোনালী পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করবে।

বর্তমান সভ্যতার প্রাণবায়ু তথাকথিত Techonology-র প্রসাদে চলছে। যন্ত্রদেবতা আজও তার লোহার শিকলে আমাদের সবাইকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, এখানে নাড়ীর যোগ বা প্রাণের আবেগ নেই। সামাজিক জীবন এই যন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে, যন্ত্রের রূঢ় আঘাতে মানুষ মৃতপ্রায়। জৈবিক জীবনের ক্ষুধা মেটানো ও যন্ত্রদেবতার দৈনন্দিন প্রসাদন করা হোল আধুনিক জীবনের মূল নীতি। মানুষের ভাবজগৎ, ধ্যানলোক, আবেগ ও সূক্ষ্ম-চিন্তা সব একে একে যন্ত্রের তলায় মিলে যাচ্ছে। এর জন্য নিষ্প্রাণ যন্ত্র দায়ী নয়, আমাদের সমাজের ওপরতলায় যে মুষ্টিকেক লোক বসে আছেন তাদের স্বার্থের ইন্ধন জোগাতে সমাজে এই মারণযজ্ঞ চলেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একদিন লক্ষ লক্ষ লোক এই কুটিল যড়যন্ত্র থেকে যন্ত্রকে মুক্ত করে, যন্ত্রকে মানুষের চলবার পথকে সুগম করবার কাজে নিয়োজিত করবে। মানুষের দাবী যন্ত্রজগতের-সবার ওপর বিঘোষিত হবে। সেই শুভদিন কবে!

কাগজের নৌকা

সরিৎশেখর মজুমদার

এতো মিষ্টি রোদ বুঝি ওর জীবনে কোন দিনই পাঠায়নি প্রভাতসূর্য। যেন বিশাখার চুড়ি-পরা নরম হাত, সংসারের আর পাঁচটা গুরুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিচুপি মশারীর কোনটুকু তুলে সমীরের গায়ে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় ডাকছে ঃ ওগো শুনছো? বেলা হয়েছে, ওঠো! চোখ মেলে চাইলো সমীর। ভুল ভাঙল, বিশাখা পাশেই শুয়ে আছে। নিশীথের স্বপ্ননিথর কালো-কালো চোখের পাতা তার, উৎসবমথিত দেহখানি শিথিল ভঙ্গীতে এলায়িত। বিশাখা নয়, প্রভাতী সূর্যের মিষ্টি রোদ ডাকছে ওকে।

—এই, বিশাখা! বিশাখা!! ওঠো!

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিশাখা। বাড়ীর বৌ, এতো বেলা অবধি ঘুমোলে নিন্দে হয় যে।

—ছিছি, তুমি কি গো? এতক্ষণ ডেকে দাওনি!

—বাঃ রে, আমারই ত ঘুম ভাঙলো এইমাত্র, ভোরের রোদ গায়ে লেগে। বিশাখা অসম্বৃত শাড়িটা সামলে নেমে যাচ্ছিল পালঙ্ক থেকে। সমীর হাতটা চেপে ধরলো।

—এই, ছাড়ো! কপট ক্রোধের মিষ্টি তিরস্কার বর্ষণ করে চাইলো বিশাখা।

—ছাড়বো না। আঁচল চেপে ধরে বললো সমীর।

আবিষ্ট বিশাখা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

—কেন ছাড়বো না, বলো ত?

প্রশ্নটা করলো সমীর নিজেই উত্তর দেবে বলে। জানালার ওপাশে নুয়ে-পড়া বাঁশবনে ঘুম-ভাঙা পাখীদের অশ্রান্ত কাকলী তখন। সমীরের মনের কথা যেন ভাষা পেয়েছে ওখানে। সারা জগৎটাকে ওরা যেন শোনাবে, সমীর কেন আজ বিশাখাকে শয্যা ছেড়ে যেতে দেবে না সংসারের নিরস কাজে।

—আজকের তারিখটা জানো বিশাখা?

—ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে তেমনিভাবেই আঁচল চেপে ধরে প্রশ্ন করলো সমীর। তারপর নিজেই বললো—

—আজ বাইশে বৈশাখ!

মৃদু হাসলো বিশাখা। জানে সে, আজ বাইশে বৈশাখ। গতরাত্রেই ভেবেছিলো, সমীরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু দেয়নি ইচ্ছে করেই। ওর নিজের মনে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে বলেই বলেনি সে—ছাড়ো, ছিঃ,—জেঠিমা আসছেন। বলে কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল বিশাখা।

বাইশে বৈশাখ! সাতটি বছর আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল এই তারিখে। সমীরের পঁচিশটি বসন্তের রঙীন চপলতা সেদিন বিশাখানাম্নী এক সপ্তদশীর দেহকে সাত-পাকে ঘিরে ধরার আনন্দে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। আবার পৃথিবী তার সূর্যপরিক্রমা শেষে সমীরের শরীরে সেই চেনা-চেনা মিষ্টি রোদের স্পর্শ দিয়ে বলছে ঃ আবার এলো বাইশে বৈশাখ! শুয়ে-শুয়েই সমীর স্মৃতিপথে পাড়ি দিল সাতবছর আগের সেই মধুর দিনটিতে। তখনও আলো-আঁধারি, সূর্য ওঠেনি। জেঠিমা ডাকছেন ঃ সমু! ওঠ্ বাবা। শীগ্‌গীর মুখ ধুয়ে আয়।

ভোর হলে আর মুখে কিছু দিতে পাবিনা। উপবাস। জেঠিমার চেঁচামেচিতে হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়ীময়। ভাই-বোন, দাদা-বৌদি সকলে উঠে পড়লো বাধ্য হয়ে। জেঠিমার বড় ব্যস্ততা! ওরে, দইয়ের হাঁড়ি কোথায়? চিঁড়ের জলটা ফেলে দে; কেউ কিছু দেখবে না! ও বড়বৌমা! নিয়ে এসো না শাঁখটা! শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি হলো, জেঠিমা নিজে হাতে দই-চিঁড়ে এক করে চটকে সমীরকে টেনে ধরে গ্রাস-গ্রাস তুলে দিলেন ওর মুখগহ্বরে। সমীর যেন ছোট্ট ছেলে, নিজে হাতে খেতে জানে না। বৌদিরা ঠাট্টাও করল এই নিয়ে। আজও কিন্তু ভালো লাগছে সমীরের সেই ক্ষণটি স্মরণ ক'রে। সেই অসহায় শিশু হয়ে যাওয়ার আনন্দ। সন্ধ্যা-বেলায় বৌদি আর বোনেরাও কি ছেলেখেলাই না করেছিলো ওকে নিয়ে। সমীর যেন এক পুতুল ওদের হাতে। গাল বাড়িয়ে অসহায়ভাবে বসে থাকতে হয়েছিল। ছিঃ ঠাকুরপো, কি গেঁয়ো লোকের মত চুল আঁচড়েছো? এই বলে চুলটি আবার জলে ভিজিয়ে খস্‌খস্ করে চিরুণী চালিয়ে ওর টেরিটা ঢেলে সাজালো বৌদি। লবঙ্গবৃন্ত চন্দনে ডুবিয়ে দুই বোন দুই গালে আলপনা দিচ্ছে তখন আর বকছে বৌদিকে ঃ আঃ, নড়িও না বৌদি!

—ঠাকুরপো !ও ঠাকুরপো! উঠলে?

স্বপ্নরাজ্যচ্যুত হলো সমীর। সেই বৌদিই ডাকছে। কিন্তু, কত ভিন্ন সুরের ডাক! সেদিনের সেই প্রাণোচ্ছল পরিহাসচটুল বৌদির কণ্ঠ থেকে সমস্ত রঙ্গরস কে যেন শুষে নিয়েছে এই ক'বছরেই। শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে জবাব দিলো সমীর।

—ও বৌদি! শোনো না ভাই একটা কথা!

বৌদিকে ছাড়া আর কাকে বলবে সমীর তার মনের কথা।

—কি কথা আবার? চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

—হোক্‌গে ঠাণ্ডা। শোনোনা।

—তোমাদের বিয়ের তারিখ মনে আছে বৌদি? কেমন একটা বিষণ্ণ ম্লান হাসির কুণ্ঠিত কুঞ্চন দেখা গেল জয়াবতীর বিগতলাবণ্য মুখাবয়বে।

—রসিকতার সময় নেই ঠাকুরপো! তোমার দাদার আবার অফিসের ভাত পেতে এক মিনিট দেরী হলে রসাতল কাণ্ড করবেন জানোনা? বলতে বলতে ফিরলো জয়াবতী।

—ও বৌদি! বৌদি! শোনো লক্ষ্মীটি। আজ বাইশে বৈশাখ, বুঝলে, আজ বাইশে বৈশাখ!

পাশে ঠাকুরঘরে বসে জেঠিমা মালা জপছিলেন। শুনতে পেয়েছেন তিনি সমীরের কথাগুলো। কেমন আনন্দ ডগমগ কথাগুলো। বাইশে বৈশাখ! হঠাৎ মনে পড়ে গেলো জেঠিমারও। —ও বড়বৌমা! বড়বৌমা—!

জয়াবতী বিরক্তই হচ্ছিল। এমনি করে বারবার লোকে ডাকলে সময়ে অফিসের ভাত সে দেয় কি করে?

—কিছু বলছিলেন মা?

যোগমায়া বললেন, সমীর কি বলছিলো যেন? বাইশে বৈশাখ? ওদের যেন বিয়ে হয়েছিল ঐদিন, তাই না?

জয়াবতীর নিজের বিয়ের তারিখ কোথায় যেন তলিয়ে গেছে এ-সংসারের ঘানি টেনে টেনে। অপরের বিয়ের তারিখ কেমন করে মনে রাখে সে? তবে হ্যাঁ, একটা খেই যেন ধরতে পারছে সে। জয়াবতী বাড়ীতে লেখাপড়া শিখেছিল দাদা-বাবার কাছে; শিখেছিল, বাঙালী জীবনের দেয়ালপঞ্জীতে কি তাৎপর্য নিয়ে জ্বলজ্বল করে পঁচিশে বৈশাখ তারিখটা। হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে জয়াবতীর, ঠাকুরপোর ফুলশয্যা হয়েছিল রবি ঠাকুরের জন্মদিনের আগের দিন আর

বিয়ে হয়েছিল তার দুদিন আগে। অর্থাৎ বাইশে বৈশাখ। —হ্যাঁ মা! ঐ দিন ঠাকুরপোর বিয়ে হয়েছিল।

তবে? তবে? যোগমায়া চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জপমালা থুয়ে রাখলেন দেবতাকে নমস্কার করে। —ও জয়দেব! জয়দেব! কোথায় গেলি বাবা? জয়দেব বড় ছেলে, জয়াবতীর স্বামী। চঞ্চল হয়ে যোগমায়া তার খোঁজে এগোলেন। সমীরকে তিনি পেটে ধরেননি, কিন্তু ন'বৌ যেদিন মারা গেল কি নিশ্চিন্ত নির্ভরতার প্রশান্তদৃষ্টি মেলে নীরবে সমীরকে সমর্পণ করে গেল ওরই হাতে। সমীর যে তাঁর পেটের ছেলের চেয়ে আপন। সেই সমীরের বিবাহতিথিতে উৎসবের আভাষটুকুও না থাকলে কি চলে। হোক্ না তা সে সামান্য, সাধারণ।

জয়দেব সাড়া দিল ঃ কি বলছো মা?

—কি আর বলবো! আজ বাইশে বৈশাখ। সমীরের বিয়ের দিন। একটা 'লক্ষণে'র দিন। কিছু মাছ এনে দে। বিশাখা একটু মাছ মুখে দিক্।

সমীর বারান্দায় দাঁত মাজছিলো। শঙ্কিত হল বেশ। —আমি আনছি জেঠিমা। দাদাকে কেন আবার বাজার যেতে বলছো।

মায়ের এই প্রস্তাবে জয়দেবের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। শোনা গেল, জয়াবতীকে ডেকে হুকুম দিল সে ঃ বড়বৌ! দুটো টাকা বার করে সমীরের হাতে দাও ত!

শাশুড়ীর কথাগুলো কানে গিয়েছিল বিশাখার। মাথার ওপরকার ঝারিটা খুলে দিয়ে স্নান করবার সময় জেঠিমার ঐ বাইশে বৈশাখের তিথিকে উৎসবের রঙে রঙীন করার আগ্রহদীপ্ত প্রস্তাব বড় খুসী করেছিল বিশাখাকে। ঝারি থেকে জল নয়, যেন কার স্নেহশীতল আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল তার মাথায়। কলতলা থেকে গা ধুয়ে ঘরে যাবার সময় ভাশুরের কথাটা শুনতে পেল বিশাখা। কেমন যেন নিষ্প্রাণ হিমহিম ঠেকলো তার কানে। টাকাটাই কি সব! সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে এককোণে কাপড় ছাড়ছিলো বিশাখা। এমন সময় মুখ ধুয়ে ঘরে এসে ঢুকলো সমীর। পিছন থেকে কপাট বন্ধ করে বিশাখার অনাবৃত দেহে একটা মিষ্টি আদর এঁকে দেবার আগ্রহে পা টিপে টিপে এগিয়েছিল সমীর। কিন্তু বিশাখার কৃষ্ণপক্ষের মত থমথমে মুখখানায় হারিয়ে গেল সব।

—আত্মসম্মানের বালাই নেই তোমার, না?

—মানে? থম্‌কে দাঁড়ালো সমীর।

—বাইশে বৈশাখ যদি পালন করতেই হয়, চুপিচুপি ক'রো, এমন হৈচৈ কোরোনা আর।

—কেন, কি হলো?

—কি হলো আবার! দুটো টাকা ছুঁড়ে দিয়েই ত' ওদের কর্তব্য শেষ। কেন, তোমার কী নিজের জোটে না?

সব যেন ঘুলিয়ে গেল সমীরের। ভোরের নরম রোদে, বাঁশবনের ঝিরঝিরে পাতা-কাঁপানো বাতাসে আর পাখীর কাকলীতে বাইশে বৈশাখের যে আনন্দ ধ্বনি শুনেছিল সমীর, তা যেন এখনই থেমে গেল।

—ঠাকুরপো! জয়াবতীর গলা শুনে অঙ্গবাস সম্বৃত করে সরে গেল বিশাখা।

—কি বৌদি?

—এই যে টাকা দু'টো। মাছ আনো।

সমীর কি করবে ভেবে পায়না।। গ্রহণ করবে, না বলবে, থাক্ বৌদি। বিশাখার দিকে চাইলো একবার অসহায় দৃষ্টি মেলে। বিশাখা তার ঐ দ্রুতগতির মধ্যে একটা উচিৎ পরামর্শ

লিখে রেখে গেল কিনা, বোধহয় হাঁতড়ে দেখলো সমীর। শেষে হাত বাড়িয়ে বৌদির কাছ থেকে নিয়েই ফেললো টাকাটা।

সমীর ভেবেছিলো, আজ অফিস যাবে না। কিন্তু চলেই গেল। একটু রাগ করেই গেল। বা, অভিমান করে। কার ওপর রাগ, কার ওপর অভিমান, নিজেও ঠিক বুঝলো না সে। বোধ হয় নিজেরই ওপর। বিশাখা ঠিকই বলেছে, বাইশে বৈশাখকে এমন করে বারোয়ারী চাঁদোয়ার নীচে নামানো উচিৎ হয়নি তার। বিশাখাও থম্‌থমে হয়ে রইলো অভিমানে। অভিমানটা সমীরের ওপর, সংসারের ওপর, নিজেরও ওপর। রান্নার কাজে যোগান দিতে এগিয়ে গেল অপ্রয়োজনেই। জয়াবতী বললো, থাক না বিশাখা! আজকের দিনটা তুই নাই বা এসব করলি। বেশ স্নেহার্দ্র ভাবেই বললো জয়াবতী কিন্তু বিশাখার স্বভাবই এমন, বেঁকলে স্বাভাবিক হতে পারে না সহজে। কোনো উত্তর না দিয়ে এটা-ওটা অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে পড়ছিলো। কালীবাড়ীতে সমীর আর বিশাখার নামে পুজো দিয়ে ফিরে যোগমায়া তাড়া দিলেন ঃ আর তোমরা দেরী কোরোনা বৌমা! খেতে বসো। ওরা দুই জা' ভাত বেড়ে বসলো। খানিক পরে জয়ার ছোট ছেলে মণ্টু রাস্তা থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে এলা। —চিঠি! চিঠি! চিঠি! —দেখিরে, কার চিঠি। ও মণ্টু, মণ্টুরে, ওরে দেখি না। ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন যোগমায়া। কিন্তু মণ্টু মানলো না। ওর মা'র হাতে আগে দেবে সে। যতই চেঁচাক না ঠাকুমা-বুড়ি।

জয়া নিল চিঠিটা। বিশাখা বসুকে লেখা। অচেনা হাতের নিটোল গোটা গোটা হরফ। সযত্নে লেখা নাম-ঠিকানা।—কার চিঠি রে? বিশাখার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো জয়া। আর একটু হলে মাছের কাঁটা গলায় আটকে যেতো বিশাখার। বছর আট-দশ আগেকার একটা হাতের লেখার চেনা-চেনা ঢেউ হঠাৎ যেন আছড়ে এসে পড়লো ওর হৃদয়তটে। এ-তটে এক-সময়ে অনাগোনা ছিল এই ঢেউয়ের। সরেও গিয়েছিল এতদিন। আবার কেন? আবার কেন? বেশ শক্ত হয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলে কি হবে, গলার কাঁটা ছাড়াবার চেষ্টায় বিশাখার ডানহাতখানা রীতিমত কেঁপে কেঁপে উঠলো। —এক গরস শুকনো ভাত গিলে ফেল, নেমে যাবে কাঁটাটা! জয়া বললো। এমনসময় পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শাশুড়ী।—কার চিঠি এলো বড়বৌমা? চণ্ডীদাসের? মণ্টুটা কিছুতেই চিঠিটা দেখালো না! চণ্ডীদাস যোগমায়ার মেজ-ছেলে। বিদেশে থাকে। অনেকদিন ধরে তার একটা চিঠি আশা করছেন।

—না মা। মেজঠাকুরপোর লেখা নয়। ছোটবৌয়ের নামে একটা খাম। যোগমায়া বিশাখার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখেন, খাওয়া ছেড়ে উঠে যাচ্ছে।—ও কি ছোট বৌমা! খাওয়া ছেড়ে উঠলে যে?

—গলায় কাঁটা বিঁধেছে জেঠিমা! আর খাবো না।

কথাটা শোনামাত্র যোগমায়া এমন করলেন যেন অমঙ্গলের এক অশরীরী ছায়া তার কালো ডানা মেলে সমীরের শুভ বাইশে বৈশাখকে বিষণ্ণ করে দিতে এসেছে।

—সে কি ছোটবৌমা! আজ এমন দিনে তুমি গলায় কাঁটা বিঁধিয়ে বসলে? জানিনা বাপু, মায়ের পুজো দিতে কোন দোষ হলো কি না! যোগমায়া কালীনাম জপতে জপতে এগোলেন। বিশাখা হাতমুখ ধুয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিলো।

মাছের কাঁটা এমন কিছু বেঁধেনি যে খাওয়া ফেলে উঠে আসতে হবে বিশাখাকে। কিন্তু কাঁটা হয়ে আচমকা বিঁধলো যে-জিনিষ তা হলো ঐ চিঠি। খাওয়া ফেলে পালিয়ে আসতে হলো তাকে। খুব সাবধানে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে খুললো সে খামটা। খুললো

আকাশ-নীল কাগজের ভাঁজ-করা চিঠিখানা। 'ইতি তোমার শুভার্থী সন্দীপ রায়।' ইতি'টাই প্রথমে পড়লে বলে আগেই স্থির করেছিলো বিশাখা। তাই, বিদ্যুৎগতিতে দৃষ্টিটা চিঠির শেষাশেষিই চলে গেল প্রথমে। সে জানতো, ইতির নীচে একটা অতি-পরিচিত নাম-সহি থাকবে, যে-নামের শব্দ-ধ্বনি তার কানে বড় মধুর ছন্দে বাজে, যে-সহির প্রতিটি অক্ষর নিটোল ঢেউয়ে বহুদিন বহুবার শুনিয়েছে তাকে এক দ্বীপের ইতিহাস। সে-দ্বীপ সন্দীপ, তার সন্দীপদা। তার উত্তরাকাশের কুঞ্জের প্রথম ভ্রমর। বিশাখা চিঠিটা ভাঁজ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। সে এক বিচিত্র অবস্থা। পাদুটো যেন মাটি ছুঁয়ে নেই, হৃদযন্ত্র যেন বিকল। হঠাৎ চমক ভাঙলো। বাইরে একাজে-সেকাজে অনাগোনা করছে জয়াবতী, তার ছায়াটা জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে যেন। বিশাখা বন্ধ করে দিল জানালা। উত্তরের, দক্ষিণেরও। পালঙ্কে গিয়ে উঠলো।

এ ভারি অন্যায়! কেন সে চিঠি লেখে এমনভাবে? কবেকার কোন্ এক পুতুলখেলার মালাবদল, তাকেই বড় করে দেখার এই ছেলেমানুষী কেন? বয়স ত অনেক হয়েছে; তার বোঝা উচিৎ বিশাখা এখন পরস্ত্রী, বিশাখার একটা সংসার আছে, সে-সংসার সমাজ মানে, সংস্কার মানে, বিয়ের মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করে।.....এই ত, সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এই সাত বছর চিঠি না-দিয়ে দিব্যি ভুলে থাকতে পেরেছো। তবে? আজ আবার চিঠি কেন? বিশাখার এতক্ষণে মনে হল, চিঠিটা ত' পড়া হয়নি তার। মনটা অজ্ঞাতসারে কুমারী বিশাখার মন হয়ে গিয়েছিল, যে-কুমারী সন্দীপদার অনেক চিঠির অনেক ছত্রের সঙ্গে সুপরিচিত। আবার ভাঁজ খুললো চিঠিটার। পশ্চিমমুখী জানালার পাল্লা দুটোর মাঝখান দিয়ে একফালি সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পালঙ্কের ওপর পড়েছে, সেইখানে ঝুঁকে পড়ে বিশাখা চিঠিটা মেলে ধরলো।

"কল্যাণীয়া বিশাখা, যতদূর স্মরণ হয় আগামী বাইশে বৈশাখ তোমাদের বিবাহতিথি। আমি এদিন বম্বে থেকে জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দোবো ইংরাজদের দেশে; হয়তো আর কখনও এদেশে ফিরবো না। তাই, তোমাদের বিবাহিত জীবনে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির প্রাচুর্য কামনা করে চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি, বিশাখা। ইতি

তোমার শুভার্থী সন্দীপ রায়।

চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি! নিচ্ছো, ত' আমার তাতে কি? আমায় কেন শোনাতে আসা এ-কথা? বলতে বলতে কেঁদে ফেললো বিশাখা, অভিমানে ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।.....সন্দীপদার বুকে কোন এক যাযাবর বাসা বেঁধে আছে। মনে পড়ে, বিশাখার যেদিন বিবাহ স্থির হয়ে গেল সমীরের সঙ্গে, সেদিনও শেষ-দেখা করতে এসে বলেছিলো সন্দীপ ঃ বিশাখা! মনে করছি দেশগ্রাম, আত্মীয়স্বজন সমাজ-সংসার, সকলের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পালাবো যেদিকে দুচোখ যায়। শেষ দেখা করতে এলাম।

...প্রথম ভালোবাসার দাবী নিয়ে বিশাখা সেদিন বিরত করতে পেরেছিলো সন্দীপকে। সন্দীপ কথা দিয়েছিল, কথা রেখেছিল এতদিন। লেখাপড়ায় ডুবে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন হয়েছিল সন্দীপদা, এ-খবর জানতো বিশাখা। এখন আবার চললে কোথায়? জীবনে বড় হবার শপথ বা সম্ভাবনা নিয়ে যদি যেতে হয়, যাও! বলে, বিশাখা আবার ফুঁপিয়ে উঠলো অভিমানে।

...জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দেবো, লিখছে সন্দীপদা। কথাগুলো মনে করিয়ে দেয় এক মধুর স্মৃতি। বর্ষায় থৈথৈ পথঘাট। বৃষ্টিতে ভিজে খেলা করছিলো ওরা দুই কিশোর-কিশোরী। পথের ওপারে সন্দীপ, যেন এক দ্বীপ। এপারে বিশাখা।

ওপার থেকে সন্দীপ বলেছিলো ঃ দে দেখি নৌকোটা ভাসিয়ে, দেখি আমার ঘাটে আসে কি না! কাগজের নৌকাটা বড় উৎসাহে ভাসিয়ে দিয়েছিল বিশাখা, পায়ে করে জল ঠেলে কৃত্রিম ঢেউ তুলে কত চেষ্টা করেছিল বেচারা, নৌকাটা ও-দ্বীপে ভেড়াবার। কিন্তু কিছুতেই গেল না। জলে ভিজে নেতিয়ে ডুবে গেল মাঝপথে।

খট্-খট্-খট্খট্। শব্দ হলো ভেজানো দরজায়।

—কে? তাড়াতাড়ি চিঠিটা ব্লাউজের নিচে লুকিয়ে উৎকর্ণ হলো বিশাখা।

—এই, খোলো! সমীরের কণ্ঠস্বর। চোখ মুছে স্বাভাবিক মুখভাব নিয়ে দোর খুললো বিশাখা। একগোছা রজনীগন্ধা আর বেলফুলের মালা হাতে সমীর দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার? এমন অসময়ে? অফিস পালিয়ে বুঝি?

—বলো ত' ফিরে যাই তাহলে! কপট ক্রোধে পিছু ফিরলো সমীর কিন্তু নিজেই আবার ঘরে ঢুকলো তাড়াতাড়ি। ও চায়না, জেঠিমা বা বৌদি ওর হাতের ঐ ফুলগুলো দেখে ফেলেন। সারা ঘর আমোদিত হয়ে গেল রজনীগন্ধা আর বেলফুলের সুগন্ধে, ফুলদানিতে সযত্নে সাজাতে সাজাতে সমীর বললো—কই, বললে না ত' কেমন ফুলগুলো?

সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো ঃ ভালো!

এতো সংক্ষিপ্ত যে বিসদৃশ ঠেকলো সমীরের কানে। ফিরে চাইলো ওর দিকে।—কি ব্যাপার? এখনও কি রাগ পড়েনি তোমার?

চুপ করে রইলো বিশাখা, পালঙ্কের একপাশে বসে অকারণে নাড়তে লাগলো হাতের কাছের খবর কাগজটা।

—মাছ মুখে দিয়েছিলে?

—দিয়েছিলাম, গলায় কাঁটা বিঁধেছিলো কিন্তু!

—কাঁটা! চিন্তিত হয়ে এগিয়ে এল সমীর।—ভালো মনে মাছের টাকা দেয়নি ওরা না?

উত্তর নেই কোনো। কেমন যেন ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে বিশাখা। দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক। অসহায়ের মত খুব সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে সমীর। কি করবে সে? বিয়ে করে যদি মনের সুখই না দিতে পেরে থাকে তার স্ত্রীকে, তবে কিসের এই বাইশে বৈশাখ পালন? কি করলে হাসিমুখে চাইবে ও? আলাদা হয়ে যাবে? বিশাখাকে নিয়ে আজ এই বাইশে বৈশাখেই যাবে নাকি অন্য কোথাও?

—বিশাখা!

কোন উত্তর এল না। একমনে হাতের খবর কাগজটা পাটে পাটে ভাঁজ করে কবেকার সেই কিশোরীবেলার অভ্যাসমত কাগজের নৌকা তৈরী করছে বিশাখা।

—বিশাখা! আজ বাইশে বৈশাখ, আজ এমনদিনে...সারা শরীরে সোহাগের জোয়ার তুলে স্ত্রীর দেহপল্লবীর ওপর ঝুঁকে পড়লো সমীর। বিশাখার স্তব্ধ দেহটা প্রতিবাদহীন ভাষায় মনে মনে বললো ঃ হ্যাঁ আজ বাইশে বৈশাখ, আজ এক জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে বিদেশ যাচ্ছে সন্দীপদা। বিদায়, চিরবিদায়।

ফুলে ফুলে কান্না চাপছে বিশাখা, আর অজান্তেই সযত্নে ভাঁজ করে গড়ছে একটা কাগজের নৌকা, যে-নৌকা কোনদিনই ভিড়বে না ও-দ্বীপে।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

—এই নে গামছা। কাপড় বার কর।

বনবিহারী তোরঙ্গের চাবিটা পকেট থেকে বার করে দেয়। তোরঙ্গ খুলে সাড়ী বার করে নিয়ে মৃগনয়নী ঘর থেকে বেরোয়। কলঘর দেখিয়ে দেয় সরলা। তারপর বলে,—তুই চান কর, রান্নাঘরে যাই। কলঘরে ঢুকে হঠাৎ বলে মৃগনয়নী,—আচ্ছা, ও ঘরে নতুনবৌ, এ ঘরে আমি তুমি কোথায় শোবে তবে?

—কেন বারান্দায়।

—বারান্দায় ত' বললে দাসী থাকে।

—আমি দাসী ছাড়া আর কি ভাই।—হাসে সরলা। এবারে হাসিটা বুকে এসে বেঁধে মৃগনয়নীর।

আর একটা কথাও বলে না।

সরলাও আর দাঁড়ায় না। ছেলে কোলে নিয়েই রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। গামছা বালতী চুবিয়ে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে কালো বৌয়ের কথা। এক একটা জীবনে দিনের পর দিন শুধু বেদনার বোঝাই বেড়ে চলে। মৃত্যু পর্যন্ত এর শেষ হয় না। কেন শেষ হয় না? কালো বৌ ত' কোন দোষ করেনি। পুঁটিদি ত' কোন দোষ করেনি। এদের মত মানুষ ত' সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। তবে কেন এদের বেদনার শেষ নেই। ভগবানের এ কোন বিচার?—বাবা কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করত মৃগনয়নী। ওর নিশ্চুপ নিথর মনের ওপর একটু আলোর রেখা ফোটে। মনে হয়, সত্যিই কি কালোবৌ আর পুঁটিদি ঠকছে। ওরা কি জীবনে ঠকবে। মন সায় দেয় না। আবার মনে হয়, জীবনে বোধহয় বেদনার প্রয়োজন আছে। সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠবার জন্যে। জীবনের ঠিক রূপটি দেখবার জন্যে দুঃখ-জ্বালার হয়ত বা দরকার। হয়ত এত বেদনায় ধুয়ে না গেলে কালো বৌ এত খাঁটি হয়ে উঠতে পারত না। সংসারে পনেরো আনা মানুষের হিসাবে ঠকলেও জীবনের কোন একটা নিগূঢ় স্থানে ওরা জিতেছে। ওরা জিতবেই। একটা নিশ্বাস ফেলে মৃগনয়নী। গামছাখানা ধুয়ে স্নান সেরে ঘরে চলে আসে। ঘরখানাও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। থাক। কাল হবে।

—তুমি স্নান করবে না?

বনবিহারীকে জিজ্ঞেস করে মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ যাব।—বলে ওঠে বনবিহারী।

আবার বসে পড়ে। মৃগনয়নী কাপড় ছেড়ে নেয়।

—কি হোল বসে পড়লে যে!

—ভাবছি।

—কি ভাবছ।

—ভাবছি দাদা এ মাস থেকে কত টাকা চাইবে?

—কেন। সব টাকা ভাসুর ঠাকুরকে দিতে না?

—না।

—কি করতে ?

—নিজে কিছু খরচ করতুম।

মৃগনয়নী হেসে বলে,—সে ভাবনা এখন থাক। স্নান করে এসো। বনবিহারী ওঠে। ভিজে গামছা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মৃগনয়নী বিছানাটা খুলে ফেলে। তোরঙ্গ বোঁচকা সব সরিয়ে রাখে এক দিকে। তোরঙ্গের ওপর বিছানা ভাঁজ করে করে রাখে। কয়েকখানা আটপৌরে সাড়ী বার করে। দড়ির ওপর রাখে। বনবিহারীর কাপড় জামা বার করে রাখে। বিছানার ভেতর থেকে কাঁথাগুলো বার করে ভাঁজ করে রাখে ওপরে। এটার ওপর ওটা, ওটার ওপর এটা, নানাভাবে সাজাতে থাকে। বেশ ভালই লাগে সাজাতে। তবু মনোমত হয় না। আজ থাক। এরপর একখানি মা কালীর পট। একখানি লক্ষ্মীর পটও আনতে হবে। দুখানা ছোট রেকাবি, দুটি গেলাস কিনতে হবে। পটের সামনে রোজ বাতাসা দিতে হবে দুখানা করে। নিদেন পক্ষে একটু গুড়। পরে হবে। ধীরে ধীরে হবে। খোকার জন্যে একটি ছোট থালা চাই। ভাত খেতে শিখবে এর পর। ওর মুখে ভাত কি একটু ঘটা করে দেয়া যাবে ? কে জানে। টাকা কেমন পায়। তার ওপর নির্ভর করছে। কতটাকা পায় এখনও জিজ্ঞেস করেনি মৃগনয়নী, টাকার অঙ্কটা জেনে নিতে হবে। ঘরটা বড্ড নোংরা লাগছে। ও ঘর থেকে ঝাঁটা গাছটি নিয়ে এলে হয়। নোতুনবৌ নিশ্চয়ই বসে আছে এখনও। কি বলে ডাকবে ওকে ? নোতুন দি! মৃগনয়নী ওদের ঘরে যায়। সামনেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ঝাঁটাটি হাতে নেয়। নতুন বৌ, তাকায়,—কি নিচ্ছ ?

—ঝাঁটা। ঘরটা বড় নোংরা।

—তা হোক। একঘরের ঝাঁটা আর একঘরে নিতে নেই।

মৃগনয়নী ঝাঁটাটা রেখে দেয়। প্রথম সম্ভাষণেই নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হয়। নতুন এতক্ষণে একটু হাসে।—বিকেলে বাজার যাবার সময় বলে দোব, তোমার ঘরের ঝাঁটা আনতে। কে বাজারে যাবে। কাকে বলবে, কিছুই জানে না মৃগনয়নী। আর একটা কথাও না বলে ওখান থেকে সোজা রান্নাঘরে চলে আসে। কালো বৌ ছেলেকে কোলের ওপর রেখেই ডালে জল ঢালছে।

—দাও, ওকে আমার কাছে দাও। ওকে নিয়ে রান্না করতে কষ্ট হচ্ছে তোমার।

সরলা তাকায়।—ওমা, কষ্ট আবার কি! বোন।

মৃগনয়নী বসে পড়ে বলে,—বসব আর কি! ঝাঁটা নিতে গিয়েছিলুম ও ঘরে। তা ঝাঁটা খেতে হোল।

—মানে ?— সরলা তাকায়।

—বললেন, বিকেলে বাজার থেকে ঝাঁটা আনিয়ে দোব।

—তবেত ভালই বলেছে।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে:— বাজারে কে যায় ?

—তোর ভাসুর। টাকা নতুন বৌয়ের কাছেই থাকে।

—এর ভেতরই!

তা হোক। দোষ আর কি!—সরলা কথাটার অন্য মানে খুঁজতে চায় না। উড়িয়ে দিতে চায়।

—সব টাকাই ওর কাছে থাকে ?

—সব। ঠাকুরপোর টাকাও।

মৃগনয়নী চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবে। কি যে ভাবে নিজেই ঠিক টের পায় না।

সরলা একগাল হেসে বলে,—তুই যেন রেগেছিস ?

—না। রাগ আর কি ?— মৃগনয়নী গম্ভীর হয়ে যায়।

—তোদের প্রথম আলাপের লক্ষণ ভাল নয়।

মৃগনয়নী নীরব।

—এ আমি জানতাম। তবু—।

—তবু কি ?—মৃগনয়নী আস্তে জিজ্ঞেস করে।

সরলা তাকায় ওর দিকে। দৃষ্টি শান্ত বড়ই করুণ। বলে,—মিলেমিশে থাকতে পারলেই ভাল।

মৃগনয়নী বলে,—তা বটে। কিন্তু—।

সরলা তাকায়।

কিন্তু আমি ত' কিছুই বলিনি। উনি আমাকে ভাল চোখে দেখলেন বলে মনে হোল না।

—সরলা কথা পালটায়।—যাকগে ওকথা।

রান্নায় মন দেয় সরলা।—বলে,—ঠাকুরপোকে একটু চোখেচোখে রাখবি।

—কেন বলোত ? তোমরা কি চোখেচোখে রাখনি ?

—ঠিক পারিনি ভাই। ইদানীং বড্ড বাড়িয়েছিল।

—কি ?

—দেখতেই পাবি। মোটকথা সন্ধ্যের পর বাড়ী থেকে বেরোতে দিবি না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। কথাটা বোঝে।

বলে,—আমার কথা যদি না শোনে ?

—তা' শুনবে। তবে আর মেয়ে মানুষ হয়েছিস কেন। একটা পুরুষকে বাঁধতে পারবি না?

মৃগনয়নী ফস্ করে বলে ফেলে,—তুমি ত' পারলে না দিদি। সরলার মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্তে। পরমুহূর্তেই ভাবটা কাটিয়ে বলে,—আমার আর কি আছে বল ? কি দিয়ে বাঁধতে পারতাম ! না আছে রূপ, না আছে সম্পত্তি। তুই বাঁধবি ওকে কি দিয়ে। বলে কোলের ছেলেকে দেখিয়ে দেয়। মৃগনয়নী কথাটা হালকা করবার জন্যে হাসে,—তবেই হয়েছে। বাঁধা-বাঁধির ভেতর আমি নেই। যা ইচ্ছে করুক। বাইরের টান কি সহজে যাবে?

—টান না ছাই। যত ছাই পাঁশ গিলে আসবে। তোর ভাসুর ত' মাঝে একদিন রাত্তিরে ওকে মারতে যায় আর কি! দু ভাইয়ে মারামারি হবার উপক্রম। অনেক কষ্টে থামাই। আমার হাতের ওপর একটা ছড়ির ঘা পড়েছিল। কব্জিটা ফুলে ছিল দুদিন।

হাসতে থাকে সরলা। মৃগনয়নী হাসে না। ঘটনাটা চিন্তা করে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। একবার জিজ্ঞেস করে!—ভাসুরঠাকুর কেন মারতে গিয়েছিলেন?

সরলা সস্নেহ স্বরে বলে,—ওসব গিলে এলে ত' জ্ঞান থাকে না। কি সব গালাগাল করছিল।

—কাকে।

সরলা বলবে কিনা একবার ভাবে। কি ভেবে বলেই ফেলে,—নতুন বৌকে।

মৃগনয়নীর কাছে ঘটনাটি আরও পরিষ্কার হয়। সরলা আবার রান্নায় মন দেয়। বনবিহারী হাজার দোষ করলেও নতুন বৌয়ের জন্যে কেউ তার—স্বামীকে মারতে গেছে। কথাটা

মোটেই ভাল লাগে না ওর। উঠে পড়ে মৃগনয়নী। ছেলে নিয়েই উঠে পড়ে, যাবার আগে সরলাকে বলে,—দুধ আছে দিদি ?

—জ্বাল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোর ছেলের জন্যে। ওবেলা থেকে দুধ বেশী রাখতে হবে তোর ছেলের জন্যে। নতুন বৌ বলে দেবেখন।

মৃগনয়নীর খুব খারাপ লাগে। গয়লাকে দুধের কথাও বলবে নতুনবৌ। সবেতেই নতুন বৌ। দুদিন মাত্র এসে এতটা জুড়ে বসেছে ভাবতেও বিশ্রী লাগে। মুখে কিছু বলে না। চাল আসে ওখান থেকে। নিজের ঘরে এসে খোকার একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে। একটা সতরঞ্চি পেতে বসে ছেলেকে নিয়ে। বনবিহারী স্নান সেরে এসে ছোট একটি আসন পেতে সন্ধ্যা করতে বসেছে। বোধহয় জপতপ করে একটু। তবে আবার রাত্তিরে কেন ওই সব গিলে আসে। মৃগনয়নী ওদিকে আর তাকায় না। বনবিহারী সন্ধ্যে করে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে বলে,—এক গেলাস জল দাও ত'! একটু মিছরীও দিও। মৃগনয়নী ওঠে। রান্নাঘর থেকে জল আনতে হয়। তার ঘরে একটা কলসী কিনতে হবে।

—মিছরী ?—বনবিহারী জিজ্ঞেস করে।

—মিছরী কোথা পাব ?

—কেন নতুন বৌঠানের কাছে চাইলেই পাবে।

মৃগনয়নী বনবিহারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে,—আমি চাইতে পারব না।

বনবিহারী একটু অবাক হয়।—কেন, কি হোল ? আরে সবই ত' ওর কাছে চাইতে হবে এর পর।

—কেন ? মৃগনয়নীর ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে।

বনবিহারী মৃগনয়নীর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু ঘাবড়ায়।—কেন আবার। মানে তার কাছেই সব ইয়ে—মানে ভাঁড়ার, টাকা পয়সা।

মৃগনয়নী কথা বলে না। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বনবিহারী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বোধহয় মিছরী চাইতে। মৃগনয়নী ছেলের কাছে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে। মনটা অকারণে তিক্ত হয়ে ওঠে। একটা গোপন অহংকারে আঘাত পড়ে ওর। আজকে এই দুভায়ের চাকরী করবার মূলে ত' মৃগনয়নীর আপ্রাণ চেষ্টা। মৃগনয়নী নিজের গয়না দিয়ে ওদের কলকাতায় পাঠিয়ে চাকরীর চেষ্টা করতে বলেছে। আজ চাকরী হবার পর, রোজগারের পর এত সহজেই সব ভুলে গেলে চলবে ? কোথাকার কে একজন নতুন মেয়েমানুষ এসে সেই রোজগারের টাকার ওপর কর্তৃত্ব করবে ? আজ কলকাতায় বাসা যে মৃগনয়নীর জন্যে একথা তারা এত সহজে কেন ভুলে যাবে ? চুপ করে পড়ে থাকে তেমনি ভাবে। কি করা যাবে ? তার ভবিষ্যত দিনগুলোর আচরণের মোটামুটি একটা তার ঠিক করে নিতে হবে। নতুনবৌকে মেনে নিয়ে চলতে হয়ত হবেই। তবু কি ভাবে, কতটা মেনে নেবে সেইটেই প্রশ্ন। তার ঘরেও কিছু কিছু জিনিষ কিনে রাখতে হবে। সে জন্যে টাকাও চাইতে হবে বনবিহারীর কাছে। সব টাকা নতুনবৌয়ের হাতে তুলে দেয়া চলবে না। কিছুতেই চলবে না। বনবিহারী আবার এসে ঘরে ঢোকে।

—কিগো আজ দুপুরে বেরোবে নাকি ? তবে তাড়াতাড়ি খাওয়া মিটিয়ে নাও।

মৃগনয়নী কথা বলে না।

—বেরোবে না আজ ?

—না।—অস্ফুট কঠিন স্বরে বলে মৃগনয়নী।

—কি হোল তোমার ?—কাছে বসে পড়ে বনবিহারী।

মৃগনয়নীর এমন কঠিন ভাব কখনও দেখেনি বনবিহারী। মৃগনয়নী নিজেও ভাবতে পারেনি কখনও যে ও এতটা কঠোর ভাব গ্রহণ করতে পারে কখনও। কারণ অবশ্যই রয়েছে। যেখানে ঘা পড়লে মানুষ সইতে পারে না, সেখানেই ঘা পড়েছে ওর। মানুষ আর সব সইতে পারে, কিন্তু যেখানে তার গোপন অহংকারের আত্মতৃপ্তি, সেখানে ঘা দিলে সইতে পারে না। আজ মৃগনয়নী এ সত্যটা দেখবার মত দৃষ্টিও হারিয়েছে। অতি সামান্য অহংকারও মানুষকে কত অন্ধ করে তোলে! বনবিহারী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কিছু।

—কি ব্যাপার বলো ত' ?

—কিছু না।—ছোট্ট জবাব দেয় মৃগনয়নী।

বনবিহারী আর কথা বাড়ায় না। বরং একটু হেসে বলে,—আজ দুপুরে না হয় ঘরটা গুছিয়ে ফেলো।

—কি গোছাব শুনি ?—মৃগনয়নীর গলায় একটু ঝাঁজ বোঝা যায়।

—কেন, জিনিষপত্তর।

—কি আছে যে গোছাব ?

বনবিহারী তবু ঠিক কথার ভাবটা ধরতে পারে না। একটু বিরক্ত হয়ে বলে,—বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে তা' থাকলেই পারতে সেখানে।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—কোন দরকার ছিল না আসবার। সেটা স্পষ্ট করে বললেই হোত।

মৃগনয়নী তাকায় বনবিহারীর দিকে। বলে,—সেইটেই বোধহয় ভাল হোত।

হঠাৎ একটু রেগে যায় বনবিহারী। এটা ওর স্বভাবই —চললুম অপিসে। ঘরে থেকে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করা পোষাবে না।

মৃগনয়নী চুপ করেই থাকে। বনবিহারী সাঁতাই জামাটা গায় দেয়। প্রথমে উলটো করে গায়ে দেয়। তারপর ধুত্তোর—বলে আবার সোজা করে গায়ে দিয়ে বাইরে এসে জুতো পরে। তবুও মৃনয়নী কিছু বলে না। একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে বনবিহারী ঘরের বাইরে মৃগনয়নীর ডাকের আশায়। মৃগনয়নী তেমনি নীরব। বনবিহারীর রাগটা আরও বাড়ে। ও সাঁতাই বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। আপিসের দিকেই যায়।

ষোলো

মনের ওপর প্রথম যে ছাপটি পড়ে, সেটি সহজে মুছে যেতে চায় না। প্রথম দিনেই কলকাতার বাসার যে ছবিটি দেখতে পেলো মৃগনয়নী, তাকে ভুলে যাওয়া ওর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হোল না। চেষ্টা যে ও করেনি তা নয়। ও আরও শুনেছে যে ভাসুর বলেছেন,—বৌমার যা দরকার, সব যেন দেওয়া হয়। ও আরও শুনেছে যে কথাটা শুনে নতুন বৌ হেসেছে। ভাসুর বলেছে,—তা নয়। ও আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। কথাটায় আরও জ্বলেছে নতুন বৌ। মুখে কি বলেছে, সেটা আর শুনতে পায় নি। ও অনেক ভেবে ঠিক করেছে কিছু বলবে না। কিছু চাইবে না। যা দেবে, তাতেই যা হয় হবে। না হয় হবে না। খোকার বার্লিটুকু পর্যন্তও নিজের কাছে রাখবে না। প্রয়োজন হলে কালোবৌকে বলবে। তাতে যা হয় হবে। এতে করে অসুবিধে যে মৃগনয়নীর হোল তা নয়। ওর হয়ে কালোবৌ নতুন বৌয়ের কাছ থেকে সব চেয়ে নিয়ে আসে।

এমন কি সুপুরীটি পর্যন্ত। বনবিহারীকেও কিছু বলল না মৃগনয়নী। বনবিহারী কিছু শুনতেও চাইল না। কাজ সেরে এসে ছেলেকে নিয়েই সময় কাটাত বেশী। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ত তারপর। আবার বেরোতে হোত ভোরে। মাসখানেক চুপ করেই কাটল। মাইনে পেয়ে বনবিহারী যখন টাকা দিতে গেল দাদাকে। তখন একটা কথা তাকে শুনতে হোল,—উপরী টাকাটাও সব দিতে হবে, নইলে চালান যাবে না বোধহয়। উপরী যে বনবিহারী কিছু পেত না তা নয়। সেটা আগে আগে সব দিত না। কিছু টাকা নিজের কাছে রাখত। সেই টাকাতেই এক আধদিন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরত। এখন কিছুদিন মদ আর খায় না বনবিহারী। তাই কি দাদা বললে একথা। মৃগনয়নী শুনে গম্ভীর হোল। মৃগনয়নীর কাছ থেকেই শুনল বনবিহারী এটা নতুন বৌয়ের শেখান কথা। শেখান কথাই দাদা বললে। তবে হয়ত সত্যিই নতুনবৌ সংসার চালিয়ে উঠতে পারছে না? বনবিহারী একটু চিন্তিত হোল। কিন্তু মৃগনয়নী হাসল, বললে,—এটা আমি বুঝেছিলাম আগেই। বনবিহারী আর বেশী কথা বলল না। কথাটা এখানেই চাপা পড়ে রইল। মাস দুয়েক আরও কাটল। মৃগনয়নী কিছুই চায় না। কালোবৌ ওর হয়ে সব চায়। নতুনবৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেও বেশী চায় না মৃগনয়নী। নেহাৎই যে-কথা না বললে নয়, তাই বলে। নতুনবৌও বেশী কথা পছন্দ করে না। কারো সঙ্গেই না। মেপে কথা বলে। মেপে হাসে। ওইটেই বোধহয় ওর ব্যক্তিত্ব। মাসকাবারের দিকে একদিন একটা ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল। মৃগনয়নীর সুতো ফুরিয়ে গিয়েছিল। একখানা কাঁথা সেলাই করতে পারছিল না। সাড়ীর পাড় থেকে সুতো খুলছিল। সরলা সেই সময়ই ঠিক ঘরে এসেছে।

—কিলো, ওকি করছিস

—কাঁথাটা সেলাই করতে হবে।

—সুতো নেই?

মাথা নাড়ল মৃগনয়নী। কথাটা সেদিনই বিকেলে নতুনবৌকে বললে সরলা।

—ওর সেলাইয়ের সুতো নেই।

নতুনবৌ কে জানে কেন হঠাৎ চটে উঠল,—সুতো নেই তা আমায় বলতে পারে না? সরলা কথাটা ঘোরায়। হেসে বলে,—বলতে বোধহয় লজ্জা পায়।

নতুনবৌয়ের মুখখানা টুকটুকে রাঙা হয়ে ওঠে।

—ও সব চালাকী। তার গরবে লাগে আমার কাছে চাইতে। এই বলে রাখছি তোমায় সে আমার কাছে নিজে এসে না চাইলে কিছু পাবে না।

—রাগ কচ্ছিস কেন?—থামাতে চায় সরলা।

—রাগ নয়। এই সোজা কথা বলে রাখলুম। তাকে বলে দিও। ঘরের ভেতর চলে যায় নতুনবৌ। সরলার মুখটা ম্লান হয়ে যায়। নতুনবৌ অত্যন্ত জেদী জানে ও। ভয় হয় মৃগনয়নী একথা শুনলে কি ভাববে। কি আর ভাববে, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেই চলবে ওকে। মৃগনয়নী তখনও সেলাই করছিল। পাড়ের সুতো খুলেই সেলাই করছে। সরলা এসে চুপ করে বসে।

—সেলাই করছিস?

মৃগনয়নী কথা না বলে ওর দিকে তাকায়।

—সুতোর কথা বলেছিলুম নতুনবৌকে।

—আমি ত' বলতে বলিনি তোমায়!

—জানি।—হাসে সরলা,—তবু আমি ত' দেখে চুপ করে থাকতে পারিনে।

—তা নতুনবৌ আজ বড় দুঃখু করলে।

—কেন, তার আবার দুঃখুকিসের?

—মুখখানা চুণ করে বলছিল, ন'বৌ আমার কাছে কিছু চায় না। আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না!

—তাই নাকি!—একটু অবাক হয়ে তাকায় মৃগনয়নী।

—হ্যাঁ। সে কত কথা! ন'বৌয়ের কাছে আমি কি অপরাধ করেছি।

মৃগনয়নী হাসে।

সরলা আবার নিজে নিজেই বলে,—তা বাপু, তুই-ই না হয় চাইলে পারিস। যা দরকার চাইলে ত' আর না দিয়ে পারবে না! আর দেবে না-ই বা কেন, ঠাকুরপো রোজগার ত' আর কম করছে না!

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে।

—চাইলে তোর ক্ষেতি নেই কিছু।

মৃগনয়নী প্রথম দিনের ঝাঁটার কথাটা ভুলতে পারেনি এখনও। গম্ভীর মুখে বলে,—না দিদি। ওর কাছে কিছু চাইতে পারব না।

—কেন দোষটা কি। তোর চেয়ে সম্পর্কে বড় ত' বটে!

—তা হোক।

—এ কিন্তু তোর অন্যায় জিদ্।

—তা হয়ত' হবে।

—কিন্তু একদিন না একদিন ত' চাইতেই হবে।

—সে কথা কিছু হলপ করে বলা যায় না।

সরলার মুখখানা এবারে যেন বেশী ম্লান হয়।—আমার একটা কথা না হয় রাখ।

—এ অনুরোধ তুমি কোর না দিদি।

মৃগনয়নীরও জেদ বেড়ে যায়। ওকে কিছুতেই রাজী করাতে পারে না সরলা! বড্ড বিপদে পড়ে যায় ও। নতুনবৌয়ের জেদের সঙ্গে মৃগনয়নীর জেদের ভাবী সংঘর্ষটা ভেবে ও আতংকিত হয়ে ওঠে। কি করবে কিছু ভেবে পায় না। মুখটা চুণ করে চলে যায়। পরদিন সকালে ছেলের জলখাবার আসে না। দুপুরে ছেলের ডিম আসে না। বিকেলেও যখন ছেলের দুধবার্লি ঘরে কেউ দিয়ে যায় না, তখন মৃগনয়নী সরলার কাছে যায় বারান্দায়। সরলা আজ ওর ঘরে একবারও আসেনি। বার বার নতুনবৌয়ের কাছে বার্লি চেয়েছে, ধমক খেয়ে চুপ করে এসে বসে আছে বারান্দায় নিজের চৌকীর ওপর। মৃগনয়নী সরলাকে এসে বলে,—ছেলের বার্লি ত' দিলে না দিদি।

সরলা চুপ করে থাকে।

—আজ কি বার্লি দেবে না?

সরলা তাকায়। চোখে ওর স্পষ্ট অসহায় ভাবটা মৃগনয়নীর চোখ এড়ায় না। ও কিছু বলবার আগেই নতুনবৌ বেরিয়ে আসে।

—ওকে বলছ কেন?' বার্লির দরকার, চেয়ে নিয়ে জ্বাল দিয়ে নিলেই পারতে!

সরলা ওখান থেকে উঠে রান্নাঘরে চলে যায়।

—না চাইলে কিছু পাওয়া যাবে না?

—না।—পরিষ্কার ছোট্ট জবাব নতুনবৌয়ের মুখে।

মৃগনয়নী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে চলে যায়।

বনবিহারী দাদার সঙ্গে অপিস থেকে ফেরে। যথারীতি নতুনবৌ স্বামীর কাছে সব বলে। বনবিহারীর কাছে বলে মৃগনয়নী।

দাদা শুনে নতুনবৌকে বলে,—হুঁ! বৌমার ব্যাভারটা কিছুদিন ধরে ভাল লাগছে না।

বনবিহারী বদরাগী। শুনেই লাল হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে,—নতুন বৌঠান!

নতুনবৌ বেরোয় না।

বনবিহারী বাইরে থেকেই বলে,—কি সব আরম্ভ হয়েছে! ছেলেটাও কি এ বাড়ীতে খেতে পাবে না?

নতুনবৌ এতক্ষণে বেরোয়। পাতাকেটে সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে গা ধুয়ে খয়েরী ডুরি সাড়ী একখানি পরেছে নতুনবৌ। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে মানসিক উত্তেজনায়। বলে চাপা কঠিন স্বরে,—চেয়ে নিলেই খেতে পেতো।

—চাইলেই পেতো! —বনবিহারী ওর স্বর নকল করে বলে। তারপর বেশ চেঁচিয়ে বলে,—চাইতে হবে কেন? টাকা কি তোমার বাবার বাড়ী থেকে এসেছে যে হাত পেতে চেয়ে নিতে হবে?

নতুনবৌ চেঁচায় না। তেমনি চাপা স্বরে বলে,—আপনার ছোটলোকের মত কথার উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

—কি আমি ছোটলোক!—সরল বনবিহারী ফেটে পড়ে,—ছোটলোকের ভাতই ত' দুবেলা খাচ্ছ!

—আপনার ভাত খাচ্ছি না?

—আলবত্ খাচ্ছ! যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! জানো কালই তোমায় দূর করে দিতে পারি।

—কে কাকে দূর করতে পারে সেটা দেখা যাবে পরে।

বনবিহারী আরও চীৎকার করে,—তোমার দাঁত কটা ভেঙে দেয়া উচিত।

দাদা বেরোয় এবার,—কি যাতা' বলছিস তুই। ওর দাঁত ভাঙলে তোর দাঁত ভাঙবার লোকও এখানে আছে জানবি!

বনবিহারী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে,—বৌয়ের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছো! লজ্জা করে না। এসো দাঁত ভাঙবে এসো। —হাত গুটিয়ে রোগা বনবিহারী কাঁপতে কাঁপতে এগোয়।

—তুই আমায় মারবি?—দাদাও এগিয়ে আসে। ব্যাপারটা চরমে ওঠবার আগেই ওধার থেকে কালোবৌ বড় ভাইকে ধরে। বনবিহারীর হাত ধরে টানতে থাকে মৃগনয়নী।

—না ছেড়ে দাও। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।—লাফাতে থাকে বনবিহারী। মৃগনয়নী জোর করে ধরে রাখে ওকে। মৃগনয়নীর সামর্থের কাছে পেরে ওঠে না বনবিহারী।

—বেরো বাড়ী থেকে। আজই বেরো।

বনবিহারী বলে,—বাড়ী কি তোমার?

—হ্যাঁ। এক্ষুণী চলে যা তোর বউ নিয়ে।—বড় ভাই চিৎকার করে।

—তুমি বেরোও। তোমার ওই রূপসী বৌ নিয়ে বেরোও।

বড় ভাই এগিয়ে আসে জোর করে। সরলা ধরে রাখতে পারে না। এসেই বনবিহারীর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। বনবিহারী এগোতে গিয়েও মৃগনয়নীর হাত ছাড়াতে পারে না।

ও চেঁচায়,—গয়নার টাকা ফ্যালো। গয়না বিক্রি করে চাকরী জুটেছে, গয়নার টাকা দাও। তবে চলে যাব।

—এক পয়সা দোব না। যা পারিস করে নিস। বলতে বলতে বড় ভাই এবার ঘরের ভেতর যায়। চৌকীর ওপর বসে পাখা নিয়ে বাতাস করে নিজেকে। সরলা পাখাটা কেড়ে নিয়ে ওকে বাতাস করে আর আশ্চর্য হয়ে দেখে নতুনবৌ শান্ত মুখে পানের বাটার সামনে বসে পান গালে দিয়ে একটু সুগন্ধি জর্দা গালে ফেলে। একবার আড় চোখে তাকায় শুধু ঘর্মাক্ত স্বামীর দিকে আর সতীনের দিকে। কি অদ্ভুত কঠিন পাষাণের মত চাউনি। বাতাস করতে করতে অবাক হয়ে দেখে সরলা। যেন এক নিষ্ঠুর মজার খেলা দেখছে কোন পাকা খেলোয়াড়। নিদারুণ সর্বনেশে উত্তেজনাকে হজম করে বেশ এক আরাম পাচ্ছে বলে মনে হয়। চোখদুটোয় সুতীক্ষ্ন তীরের ফলার মত একটা ঝিলিক দেখা যায় শুধু।

মৃগনয়নী বনবিহারীকে ঘরে নিয়ে আসে। ঘরে এসে বনবিহারী শুয়ে পড়ে। বলে শুধু,—মাথাটা কেমন করছে। বলতে বলতে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে অজ্ঞান। হাত পা ছুঁড়তে থাকে। দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে ওকে জোর করে চেপে ধরে মৃগনয়নী নিজের বুকে। নরম বুকে বনবিহারীর পাঁজরার হাড়গুলোয় বড় ব্যথা লাগে। বনবিহারী বেঁকে যায় ধনুকের মত। মৃগনয়নীর শক্তসমর্থ শরীর। ওর সর্বাঙ্গের চাপে বনবিহারী বেশী আছড়াতে পারে না। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে হাত পা ছোঁড়া কমে আসে। হিসটিরিয়ার বেগটারও অনেক নরম পড়ে। আস্তে আস্তে নিজেকে আলগা করে নেয় মৃগনয়নী। সর্বশরীর ওর ঘেমে গেছে। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বনবিহারীকে ছেড়ে দিয়ে এক গ্লাস জল ভরে। নিজে খেয়ে নেয় সবটা জল। তারপর আর এক গ্লাস জল ভরে বনবিহারীর মাথায় চোখে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়। ওর জামাটা ছাড়িয়ে দেয় আস্তে আস্তে। চাপা দাঁতের ভেতর জোর করে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁ করিয়ে জল খাওয়ায়। ওর নিজের মাথাটার ভেতরও কেমন ঝিম্ঝিম্ করে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। মনের সবটুকু জোরকে এক করে নিয়ে স্থির হয়ে থাকে ও। ছেলেটা উঠে বসেছে ঘুম ভেঙে। উঠুক। ভাল লাগছে মৃগনয়নীর। বনবিহারী কিছু-ক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়। বনবিহারীর কাছে গিয়ে ও ওর গালের ওপর আঙুল বুলিয়ে বলে,—খুব লেগেছে বোধহয়? বড় ভাই চড়টা মেরেছিল খুবই জোরে। বন-বিহারী ঘাড় নাড়ে শুধু। ওর চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। সরল মূর্খ বনবিহারী রাগ করতে পারে, রাগ করবার পর কাঁদতে পারে। পাঁচবছরের শিশুর মত ওর মুখখানা কোলের ওপর টেনে নেয় মৃগনয়নী। বলে,—পুরুষ মানুষ আবার কাঁদে নাকি!

বনবিহারীর কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ। কথা বলতে পারে না। ওযে মার খাবে এ কথা স্বপ্নেও ভাবেনি।

মৃগনয়নী আস্তে আস্তে বলে,—আমি ত' রয়েছি। তোমার কোন ভাবনা নেই। আজ থেকেই আলাদা থাকব আমরা। তুমি যে কটা টাকা পাও তাতেই আমি চালাতে পারব। কিছু ভেবো না।

বনবিহারী শুধু বলে,—একটা পয়সাও যে নেই।

মৃগনয়নী বলে,—আমার কাছে আছে কয়েকটা টাকা। অনেকদিনের—বিয়ের সময়কার টাকা। ওইতেই কটা দিন চলবে।

—আমি যে মাত্র পঁচিশটাকা পাই। দাদা অনেক বেশী পায়।

—পঁচিশ টাকায় খুব চলবে।

—অবিশ্যি উপরী আছে। উপরীও দাদা বেশী পায়। বাইরে যায় কিনা! আমি কোন কোন মাসে কিছুই পাই না।

—তা হোক। ঠিক চলে যাবে। এখন উঠতে পারবে?

ধীরে ধীরে ওঠে বনবিহারী।

মৃগনয়নী গামছা এগিয়ে দেয়,—যাও। ভাল করে স্নান করে নাও। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। তারপর দোকানে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে এসো। ছেলেটাও কিছু খায়নি।

আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটো। বনবিহারী ওঠে। স্নান করতে যায়। স্নান সেরে এসে মা কালীর ছোট পটখানার সামনে গিয়ে একটু জপ করে। গায়ত্রী। তারপর পটের দিকে তাকিয়ে—মা মা—বলে ওঠে অস্ফুটে। মায়ের ওপর ওর ভারী টান। মৃগনয়নীর বেশ ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। এতদিনে যেন মনের ওপর থেকে একটা কঠিন বাঁধন খুলে গেল। কি একটা যেন ওর মনটা বেঁধে সংকুচিত করে রেখেছিল এতদিন। আজ সব আলগা। মন খোলা, প্রাণ খোলা। একটা বঞ্চিত আরামের স্বাদ একটু একটু করে অনুভব করছে মৃগনয়নী। তোরঙ্গের কাছে গিয়ে তোরঙ্গ খোলে। একেবারে তলায় একটুকরো ন্যাকড়ায় বাঁধা সাতটা টাকা বার করে। তার থেকে একটা টাকা বনবিহারীর হাতে দেয়।

—খাবার নিয়ে এসো।

বনবিহারী টাকা পেয়ে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোয়। মৃগনয়নী দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার চুপ করে বসে থাকে। মাস কয়েকের ভেতরই যে এমন খোলাখুলিভাবে মনের রূপগুলো প্রকাশ পাবে, এমন আশা মৃগনয়নী করেনি। ভালই হয়েছে। যে কোনও খারাপ অবস্থাকেই সে ভয় করবে না। ভয় করলে তার এইটুকু জীবনে এতটুকুও সে এগোতে পারত না।

(ক্রমশঃ)

স্বরগ্রাম

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কে যেন আমায় ডেকে বলেছিলো, এসো
আকাশে উড়িয়ে দেবো উতল ফানুস
সেইখানে তুমি হাল্কা হাওয়ায় ভেসো।
অনেক নিচের থেকে পৃথিবী মানুষ
পাবে যেন তোমার সে পরিপূর্ণ ছবি।
এবং ভাবিত হবে অন্যদেশী চোখে
কেন-বা এসব তারা ভুলেছিলো সবি।
তারপর মনে মনে বিবর্ণ আলোকে
বেড়াবে ঠিকানা খুঁজে ধূসর খামের;
অতোদিনে নায়িকার বিষণ্ণ বিরতি।
আবার হবে না যোগ বিযুক্ত প্রাণের,
আনমনে বাঁক নেবে নদীর নিয়তি।

হতবাক হেমন্তের অবসিত গানে
অভিজ্ঞান সরোবর ছায়া ডেকে আনে॥

জীবন-জিজ্ঞাসা

উৎপল চৌধুরী

আঁকা বাঁকা সরু পথ চিহ্নিত রেখার মত
পাহাড়ের কোলে কোলে নেমে গেছে কত।
'চা'এর বাগান দিয়ে ওঠে আর নামে,
মাঝে মাঝে গিয়ে শুধু থামে

যেখানে রয়েছে ঘর
সবুজ বা লাল টিনে ছাওয়া,
যেখানে পাহাড়ী হাওয়া
লুকোচুরি খেলে,
যেখানে উদ্দাম মন
চলে পাখা মেলে
ভেসে ভেসে যায়
সুদূর ইশারা ঘেরা বনের ছায়ায়।

যেখানে আকাশ নামে পাহাড়ের কোলে,
দিনশেষে ক্লান্ত সূর্য যেই পথে চলে,
সেই পথে, একা আমি—
কখনো বা চলি আর কখনো বা থামি।

আঁধারে হারিয়ে গেছে পথের ঠিকানা
আরো কত দূর? সে তো হয় নাই জানা,
শুধু জানি—
আঁধারের পারে আছে আলোকের দেশ।
সেখানেও পাব না কি তোমার উদ্দেশ?

সাহিত্যে ব্যষ্টি ও সমাজ

একটা কথা প্রায়ই আজকাল সাহিত্য সংক্রান্ত সভা ও মজলিসে আলোচনা হতে শোনা যায় যে, যে-সাহিত্য আজকালকার অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্কেরা লিখছেন—তাতে তো ব্যষ্টি জীবনের সুখ-দুঃখ স্নেহ প্রেম লজ্জা অনসূয়া প্রভৃতির নামগন্ধ নেই, তবে গোষ্ঠী বা সমষ্টি জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা এক মহান রূপ গ্রহণ করে ফুটে উঠেছে। এটা কি ভালো হচ্ছে?

প্রশ্নটা বিচার্য। এই প্রশ্নের সঙ্গে আশা করি সাহিত্যে বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ বিষয়ক জিজ্ঞাসাকে টেনে আনবেন না কেউই, কারণ বাস্তববাদিতার দিক থেকে চিহ্নিত সাহিত্য—এবং আদর্শবাদের লক্ষ্যের পথে বিচরণশীল সাহিত্য—এই উভয় সাহিত্যে উপজীব্য বিষয় তো ব্যষ্টি জীবন বা সামাজিক জীবনকে প্রকটিত করতে পারে। আসলে এই প্রশ্নটি সাহিত্যের উপজীব্যতার সঙ্গে জড়িত।

অনেকের ধারণা, সাহিত্য সকলের সঙ্গে মেলামেশার তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। লেখক ও পাঠকের চিন্তার মেলবন্ধনের যে সাহিত্য তাইতো সাহিত্য। আর, পাঠকের চিন্তা কখনোই একক বা ব্যক্তিমুখী হতে পারে না,— এঁদের দলের চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুষ্ট করলে এই রকম দাঁড়ায় যে সকলকে নিয়ে যে সাহিত্য—তাই সমাজকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারবে, তার পেছনে রসনিষ্পত্তির যে কৌশলই থাক না কেন, কল্যাণ সাধনার ব্রতের দিক থেকেও তাকে যথার্থ উত্তীর্ণ সাহিত্য বলতে হবে। আমার একার মনকে বা শুধু লেখকের মনকে সুবিমল আনন্দে ভরিয়ে তুলে তাকে তুরীয়লোকে ন্যস্ত করা কখনোই সাহিত্যের কাজ হতে পারে না। সমাজের সঙ্গে সমাজের জন মানবের সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই। পাঠক সাহিত্য পাঠ করে পরম চরিতার্থতার সঙ্গে যেন বলতে পারে—

'পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।'

সুতরাং ব্যষ্টি জীবনের, একক জীবনের, নিছক লেখকজীবনের সুখ দুঃখ প্রীতি প্রেমের মর্মদা সাহিত্যে এমন কিছু মহান নয়।

এঁদের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—সাহিত্যের বাঞ্জনাই হচ্ছে রসলোকে নিয়ে যাওয়ার পথ প্রদর্শক। সাহিত্যের বিষয়টা নিতান্ত গৌন। সুতরাং ব্যক্তিক ব্যথা-বেদনা, সুখ বা সৌকুমার্য —যাই থাক না, তা আমরা দেখবো না কেমন ভাবে পরিবেশিত হয়েছে, কেমনভাবে তা আমাদের অন্তরলোকের অনুভবগুলিকে প্রভাবিত করেছে—তাই বিচার করে দেখবো। এই নিরিখেই সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন ঘটে।

তৃতীয় দল বলেন,—রীতি, বাচ্যবস্তু ইত্যাদি জটিল বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সাহিত্য বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কবি বা লেখক যা ভাবেন—তাঁর ভাবনা সুচারুরূপে আমা-

দের মননে যদি বাসা বাঁধে—তবেই তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করে নেব। বিশ্লেষণের তার্কিক ও জটিল রজ্জুতে বেঁধে সাহিত্যের রস সম্পদকে সংকুচিত করতে তারা নারাজ। সাহিত্য পলিটিক্স নয়, তাই দলের কথা গলাবাজী করে প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে শোভন নয় বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

ঝগড়াটা হোল এই নিয়ে। এখন দেখতে হবে এর সমাধান কি ?

সাহিত্যের—বিশেষ করে রস সাহিত্যের প্রধান বিভাগ হলো দুটো, গদ্য ও পদ্য। পদ্যের মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর অনুভবলোকের সমস্ত অনুরণনগুলিকে রূপায়িত করেন। বাইরের জগৎ, বাইরের জীবন—তাঁর মানসলোকে আবর্তন ও আলোড়ন সুরু করেছে, কবি শুধুমাত্র তাই-ই প্রকাশ করেন। তিনি বাস্তবলোকের অনুভবগুলিকে কল্পনার ছন্দে নানারূপে বিভূষিত করে থাকেন, ফলে চেনা জানা একান্ত ঘরের জিনিস এক অনির্বচনীয় রসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর গদ্যকর্মে লেখক সমাজজীবনের সমগ্রতাকে কেন্দ্র করে সচল হয়ে ওঠেন। তিনি যা ভাবেন, যা দেখেন, তা তাঁর চিত্তে জমা হয় কিছুকাল, পরে তাকে রূপদান করে থাকেন। ফলে, সমাজ-পরিবেশের একটা কাঠামো তার লেখায় ধরা পড়ে।

তাই এক কথায় বলা যায় যে কাব্যে কবির ব্যক্তিসত্তাই বড় হয়ে ওঠে। কবি কর্মের মধ্যে দিয়ে বিরাট সমাজমানসকে ফুটিয়ে তোলা যায় না, বিশেষ করে লিরিক কবিতার মাধ্যমে। স্বল্প অনুভূতির মণ্ডলে যে কাব্যায়ন বা কবির এক বিশেষ মুহূর্তের মনোবিকারের ফসলজাত যে উৎপাদন—তাই যদি কবিতার আকার ধারণ করে সেখানে তো কবির ব্যক্তিসত্তাও প্রকট হয় না, শুধুমাত্র একটি ভাবাবেগই বড় হয়ে ওঠে। তাই কাব্যের, বিশেষ করে লিরিক কাব্যের উপজীব্য কখনোই সমাজজীবন হয় না। সে-কাব্য রচনাকালের পূর্বে যতোই কেননা তারস্বরে একথা বলে থাকি—

'জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

অবশ্য এখানে একটু তর্কের অবকাশ আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে যদি উদাহরণ হিসেবে সামনে তুলে এনে ধরি—তবে দেখবো যে তার কবি-কর্মে বিরাট এক সমাজ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর সমসাময়িক যুগের এক বিরাট ও ব্যাপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। সামাজিক জীবনই সেখানকার প্রধান কথা। আমার মনে হয়, যখন লিরিক কবিতার মাধ্যমে কবির সত্তা কার্যকরী হয় বলা হচ্ছে তখন মুকুন্দরামের উল্লেখ সমীচীন নয়। কেননা, মুকুন্দরাম বাহ্যতঃ কবি হলেও মূলতঃ ঔপন্যাসিকের ধর্মেদীক্ষিত হয়েছিলেন, গদ্য-কর্ম তখন সাহিত্যের বাহন হয় নি এবং সাহিত্যস্রষ্টাবর্গ তখনো গদ্যের মাধ্যম সম্পর্কে এ-দেশে সজাগ হন নি—ফলে কাব্যের বন্ধনই মুকুন্দরামকে উপন্যাসকল্প সাহিত্যসৃষ্টি করতে হয়েছে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের সমাজসত্তা কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। গাথা, কাব্য, মহাকাব্য—এক কথায় বিশালকায় ও সুব্যাপ্ত কাব্য সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে।

তবু আমরা লিরিক কবিতা যে পড়ি না—তা নয়। আমরা জানি, শ্রেষ্ঠকবি কাব্য লেখেন তার ব্যক্তিত্বের অলঙ্ঘনীয় আদেশেই। কাব্য লিখে তিনি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজন, দাবী আর প্রত্যাশা পূরণ করছেন। তার পরিণতিকে সাহায্য করছেন। কবি তাঁর মনুষ্যত্বের দায়িত্ব নির্বাহ করে। তিনি আপনাকে নিজের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ করেন। অপরের কাছে নিজেকে নিজের শ্রেষ্ঠতমরূপে ধরে নিয়ে দেশ, কাল, সমাজের কাছে নিজের অস্তিত্বকে অর্থযুক্ত করেন। জগতের কাছ থেকে কবি যা গ্রহণ করেন, জগৎ-সমাজের জীবনকে পূর্ণতর সুন্দরতর

করতে তার মূল্য দেন। 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,' এ-বাসনাকে অকৃত্রিম বলে বুঝতে পারি। কবি সমাজবিমুখ বা 'এ্যান্টি সোস্যাল' জীব নয়।

এই কথাকে আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যেতে পারে, কবি কাব্য রচনা করলেন—তাঁর একটি ভাবাবেগকে গ্রথিত করলেন। কবি তো নিজে একজন সমাজের অংগীভূত জীববিশেষ। তাঁর মন ও মনন যখন কাব্যে প্রকট হয়ে উঠলো, তখনই সমাজসত্তার একটি চেতনা বা সামাজিক বোধের একটি মাত্র ভগ্নাংশ কি এই কাব্যে ধরা পড়লো না ? অর্থাৎ কাব্য ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট আবেগযুক্ত হয়েও কি সে ললাটে সমাজজীবনের পরিচয় তিলক বহন করলো না ?

কাব্য তাই ব্যক্তি মানসের মধ্যে দিয়ে সমাজ চেতনাকে প্রস্ফুট করে তুলতে পারে।

গদ্যকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আর নেই। তবু গদ্যকর্মের মাধ্যমেই যখন সমাজ-জীবন আবর্তিত হয়—তখন গদ্য-কর্মের সমাজসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে চলে না। গদ্যের মধ্যে দিয়ে সমাজ-জীবন যত সহজে ধরা দেয়—অন্য কোনো রকম সাহিত্য প্রকরণে ততো নয়।

গদ্যের উপন্যাস লেখক জীবন-নাট্যের একজন দর্শকমাত্র নন। যে হেতু তিনি সামাজিক জীব, তিনিও একজন নিষ্ঠাবান অভিনেতা। তাঁরও করণীয় আছে। যে উপন্যাস তিনি সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির পূর্বকালে তার প্রস্তুতি অচিন্ত্যনীয়। বছরের পর বছর ধরে তিনি বিশাল জন সমুদ্রে সন্তরণ করেন। হয়তো ডুব দেওয়া তাঁর পক্ষে সর্বত্র সম্ভব নয়। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দের, উদ্বেল দুঃখের, বেদনার, হতাশার, দৈন্যের জীবন যাপন করতে গিয়ে জীবনের গভীরতায় তাকে অনুলিপ্ত হতে হয়। তবেই তিনি উৎকৃষ্ট উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সাহিত্য—যা' জীবন পর্যালোচনারই নামান্তর তা' জীবনের গভীর অনুভূতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং যা' কখনোই কল্পনাকে জাগ্রত করে না, তা' দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করা সম্ভব হয় না; কেননা সেখানে লেখকের হৃদয়ের যোগ নেই। কল্পনা তখনই জাগ্রত হতে পারে যখন লেখক আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। লিখতে জানলেই যে লিখতে পারা যায়—তা' সত্য নয়। অনুভব যখন লেখকের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ চাইছে তখনই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। লেখক সমাজজীবনের বহু মানুষ থেকে তিল তিল করে একেকটি সম্পূর্ণ তিলোত্তমারূপী মানুষ সৃষ্টি করেন। তারপর পাঠকেরাই একদা আবিষ্কার করেন যে তাদেরি কোনো ঘটনা বা আচরণ পরিবর্তিত হয়ে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অথবা তাদেরি বলা কোনো কথা অন্য লোককে দিয়ে বলানো হয়েছে। এমনি করে কারো চেহারা, কারো চিন্তা কারো হৃদয় নিয়ে একটি পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে ওঠে। তারপর, মজা হচ্ছে এই যে 'লেখক যেইমাত্র একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন অমনি পৃথিবীতে আরেকটি মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়।' এমনি করেই পৃথিবী জনপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উপন্যাস-নাটক-গল্প প্রভৃতির কথা ছেড়েদিয়ে গদ্যের অন্য বিভাগে এবারে আসা যাক।

গদ্যের মধ্যে যেগুলি লেখক নিজের মনের একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতিকে অলঙ্কৃত করে প্রকাশ করেন—সেখানে সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার প্রক্ষেপই বড় হয়ে ধরা পড়ে। এই জাতীয় রচনাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য বা কাব্যধর্মী গদ্য বলা হয়—ইংরাজী নাম হলো 'পার্সোনাল এসে,' ফরাসী নাম 'বেলে লেতর'। আর, গদ্যকর্ম যখন বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়—তখন তাতে সমাজ-জীবনের এক অংশ চিত্রিত হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য একজনের একক সত্তা রূপায়িত হয়েই শেষ হয় না। যে কোনো একজন ঔপন্যাসিকের যে কোনো বইকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। লেখক যে পটভূমি ও চিত্রনক্ষেত্র অঙ্কিত করেন—সেখানে তিনি তার বুদ্ধিগম্যতার

দের মননে যদি বাসা বাঁধে—তবেই তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করে নেব। বিশ্লেষণের তার্কিক ও জটিল রজ্জুতে বেঁধে সাহিত্যের রস সম্পদকে সংকুচিত করতে তারা নারাজ। সাহিত্য পলিটিক্স নয়, তাই দলের কথা গলাবাজী করে প্রকাশ করা সাহিত্যের পক্ষে শোভন নয় বলেই তাঁদের বিশ্বাস।

ঝগড়াটা হোল এই নিয়ে। এখন দেখতে হবে এর সমাধান কি ?

সাহিত্যের—বিশেষ করে রস সাহিত্যের প্রধান বিভাগ হলো দুটো, গদ্য ও পদ্য। পদ্যের মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর অনুভবলোকের সমস্ত অনুরণণগুলিকে রূপায়িত করেন। বাইরের জগৎ বাইরের জীবন—তাঁর মানসলোকে আবর্তন ও আলোড়ন সুরু করেছে, কবি শুধুমাত্র তাই-ই প্রকাশ করেন। তিনি বাস্তবলোকের অনুভবগুলিকে কল্পনার ছন্দে নানারূপে বিভূষিত করে থাকেন, ফলে চেনা জানা একান্ত ঘরের জিনিস এক অনির্বচনীয় রসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর গদ্যকর্মে লেখক সমাজজীবনের সমগ্রতাকে কেন্দ্র করে সচল হয়ে ওঠেন। তিনি যা ভাবেন, যা দেখেন, তা তাঁর চিত্তে জমা হয় কিছুকাল, পরে তাকে রূপদান করে থাকেন। ফলে, সমাজপরিবেশের একটা কাঠামো তার লেখায় ধরা পড়ে।

তাই এক কথায় বলা যায় যে কাব্যে কবির ব্যক্তিসত্তাই বড় হয়ে ওঠে। কবি কর্মের মধ্যে দিয়ে বিরাট সমাজমানসকে ফুটিয়ে তোলা যায় না, বিশেষ করে লিরিক কবিতার মাধ্যমে। স্বল্প অনুভূতির মণ্ডলে যে কাব্যায়ন বা কবির এক বিশেষ মুহূর্তের মনোবিকারের ফসলজাত যে উৎপাদন—তাই যদি কবিতার আকার ধারণ করে সেখানে তো কবির ব্যক্তিসত্তাও প্রকট হয় না, শুধুমাত্র একটি ভাবাবেগই বড় হয়ে ওঠে। তাই কাব্যের, বিশেষ করে লিরিক কাব্যের উপজীব্য কখনোই সমাজজীবন হয় না। সে-কাব্য রচনাকালের পূর্বে যতোই কেননা তারস্বরে একথা বলে থাকি—

'জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

অবশ্য এখানে একটু তর্কের অবকাশ আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে যদি উদাহরণ হিসেবে সামনে তুলে এনে ধরি—তবে দেখবো যে তার কবি-কর্মে বিরাট এক সমাজ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাঁর সমসাময়িক যুগের এক বিরাট ও ব্যাপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। সামাজিক জীবনই সেখানকার প্রধান কথা। আমার মনে হয়, যখন লিরিক কবিতার মাধ্যমে কবির সত্তা কার্যকরী হয় বলা হচ্ছে তখন মুকুন্দরামের উল্লেখ সমীচীন নয়। কেননা, মুকুন্দরাম বাহ্যতঃ কবি হলেও মূলতঃ ঔপন্যাসিকের ধর্মেদীক্ষিত হয়েছিলেন, গদ্য-কর্ম তখন সাহিত্যের বাহন হয় নি এবং সাহিত্যস্রষ্টাবর্গ তখনো গদ্যের মাধ্যম সম্পর্কে এ-দেশে সজাগ হন নি—ফলে কাব্যের বন্ধনই মুকুন্দরামকে উপন্যাসকল্প সাহিত্যসৃষ্টি করতে হয়েছে। তাই চণ্ডীমঙ্গলের সমাজসত্তা কাব্যপ্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। গাথা, কাব্য, মহাকাব্য—এক কথায় বিশালকায় ও সুব্যাপ্ত কাব্য সম্পর্কেও এই একই কথা খাটে।

তবু আমরা লিরিক কবিতা যে পড়ি না—তা নয়। আমরা জানি, শ্রেষ্ঠকবি কাব্য লেখেন তার ব্যক্তিত্বের অলঙ্ঘনীয় আদেশেই। কাব্য লিখে তিনি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়োজন, দাবী আর প্রত্যাশা পূরণ করছেন। তার পরিণতিকে সাহায্য করছেন। কবি তাঁর মনুষ্যত্বের দায়িত্ব নির্বাহ করে। তিনি আপনাকে নিজের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ করেন। অপরের কাছে নিজেকে নিজের শ্রেষ্ঠতমরূপে ধরে নিয়ে দেশ, কাল, সমাজের কাছে নিজের অস্তিত্বকে অর্থযুক্ত করেন। জগতের-কাছ থেকে কবি যা গ্রহণ করেন, জগৎ-সমাজের জীবনকে পূর্ণতর সুন্দরতর

করতে তার মূল্য দেন। 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,' এ-বাসনাকে অকৃত্রিম বলে বুঝতে পারি। কবি সমাজবিমুখ বা 'এ্যান্টি সোস্যাল' জীব নয়।

এই কথাকে আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যেতে পারে, কবি কাব্য রচনা করলেন—তাঁর একটি ভাবাবেগকে গ্রথিত করলেন। কবি তো নিজে একজন সমাজের অংগীভূত জীববিশেষ। তাঁর মন ও মনন যখন কাব্যে প্রকট হয়ে উঠলো, তখনই সমাজসত্তার একটি চেতনা বা সামাজিক বোধের একটি মাত্র ভগ্নাংশ কি এই কাব্যে ধরা পড়লো না ? অর্থাৎ কাব্য ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট আবেগযুক্ত হয়েও কি সে ললাটে সমাজজীবনের পরিচয় তিলক বহন করলো না ?

কাব্য তাই ব্যক্তি মানসের মধ্যে দিয়ে সমাজ চেতনাকে প্রস্ফুট করে তুলতে পারে।

গদ্যকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আর নেই। তবু গদ্যকর্মের মাধ্যমেই যখন সমাজ-জীবন আবর্তিত হয়—তখন গদ্য-কর্মের সমাজসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে চলে না। গদ্যের মধ্যে দিয়ে সমাজ-জীবন যত সহজে ধরা দেয়—অন্য কোনো রকম সাহিত্য প্রকরণে ততো নয়।

গদ্যের উপন্যাস লেখক জীবন-নাট্যের একজন দর্শকমাত্র নন। যে হেতু তিনি সামাজিক জীব, তিনিও একজন নিষ্ঠাবান অভিনেতা। তাঁরও করণীয় আছে। যে উপন্যাস তিনি সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির পূর্বকালে তার প্রস্তুতি অচিন্ত্যনীয়। বছরের পর বছর ধরে তিনি বিশাল জন সমুদ্রে সন্তরণ করেন। হয়তো ডুব দেওয়া তাঁর পক্ষে সর্বত্র সম্ভব নয়। কিন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দের, উদ্বেল দুঃখের, বেদনার, হতাশার, দৈন্যের জীবন যাপন করতে গিয়ে জীবনের গভীরতায় তাকে অনুলিপ্ত হতে হয়। তবেই তিনি উৎকৃষ্ট উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারেন। কেননা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সাহিত্য—যা' জীবন পর্যালোচনারই নামান্তর তা' জীবনের গভীর অনুভূতির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং যা' কখনোই কল্পনাকে জাগ্রত করে না, তা' দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করা সম্ভব হয় না ; কেননা সেখানে লেখকের হৃদয়ের যোগ নেই। কল্পনা তখনই জাগ্রত হতে পারে যখন লেখক আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। লিখতে জানলেই যে লিখতে পারা যায়—তা' সত্য নয়। অনুভব যখন লেখকের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ চাইছে তখনই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। লেখক সমাজজীবনের বহু মানুষ থেকে তিল তিল করে একেকটি সম্পূর্ণ তিলোত্তমারূপী মানুষ সৃষ্টি করেন। তারপর পাঠকেরাই একদা আবিষ্কার করেন যে তাদেরি কোনো ঘটনা বা আচরণ পরিবর্তিত হয়ে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। অথবা তাদেরি বলা কোনো কথা অন্য লোককে দিয়ে বলানো হয়েছে। এমনি করে কারো চেহারা, কারো চিন্তা কারো হৃদয় নিয়ে একটি পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে ওঠে। তারপর, মজা হচ্ছে এই যে 'লেখক যেইমাত্র একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন অমনি পৃথিবীতে আরেকটি মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়।' এমনি করেই পৃথিবী জনপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উপন্যাস-নাটক-গল্প প্রভৃতির কথা ছেড়োদিয়ে গদ্যের অন্য বিভাগে এবারে আসা যাক।

গদ্যের মধ্যে যেগুলি লেখক নিজের মনের একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতিকে অলংকৃত করে প্রকাশ করেন—সেখানে সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার প্রক্ষেপই বড় হয়ে ধরা পড়ে। এই জাতীয় রচনাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য বা কাব্যধর্মী গদ্য বলা হয়—ইংরাজী নাম হলো 'পার্সোনাল এসে,' ফরাসী নাম 'বেলে লেতর'। আর, গদ্যকর্ম যখন বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়—তখন তাতে সমাজ-জীবনের এক অংশ চিত্রিত হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য একজনের একক সত্তা রূপায়িত হয়েই শেষ হয় না। যে কোনো একজন ঔপন্যাসিকের যে কোনো বইকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। লেখক যে পটভূমি ও চিত্রনক্ষেত্র অঙ্কিত করেন—সেখানে তিনি তার বুদ্ধিগম্যতার

লাগি দিয়ে যে তলদেশ স্পর্শ করতে পারেন—সেই নিম্নতলকে অঙ্কিত করে থাকেন।

সুতরাং গদ্য-কর্মের মধ্যে যে সমাজসত্তা থাকে—তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই অনস্বীকার্যতার পরেও একটা কথা থেকে যায়। তা' হচ্ছে এই যে—গদ্যকর্মের মধ্যে যে সামাজিক জীবন চিত্রিত হয়—তা' তো হয় লেখকের শিল্পী-মনের আয়নার ভেতর দিয়ে—যে-কথা একটু আগেই অন্যভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে—এখানেও তো একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণই প্রথম কথা—এবং তারপর সেই দৃষ্টি দিয়ে কি দেখা হচ্ছে—সেটা। সমাজজীবন তাই সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে ততোটা উপস্থিত নয়—যতোটা কবির মানস চিন্তার প্রতিফলন নিয়ে। অর্থাৎ **রামের জন্মভূমি অযোধ্যা ততোটা সত্য নয়, যতোটা সত্য কবির মনোভূমি।**

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা যেতে পারে। গদ্য লেখকই ধরা যাক—একটি বিশেষ ধরণের একক চরিত্র আঁকলেন। ধরা যাক, অধ্যাত্মলোকের একজন পবিত্র বাসিন্দা সাধুবাবা। আবার কেউ আঁকলেন শঠ ধূর্ত, মনুষ্যমধ্যগত শৃগাল সদৃশ একচরিত্র। বা এই জাতীয় ভিন্ন উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন টাইপ। (এখানে একই লেখকের কলমে অঙ্কিত আমাদের পরিচিত দুটি ভিন্ন টাইপের চরিত্রের কথা—উল্লেখ করছি। যথা সেক্সপিয়রের সৃষ্ট, 'ওথেলো' এবং 'ইয়াগো'।) এইগুলিকে সামাজিক জীবনের অধিকারী বলা যাবে কি ? না, এদের সমাজ সত্তায় স্থান না দিয়ে ব্যক্তিক কোটারীতে ফেলে রাখতে হবে ? সাহিত্যের ক্ষেত্রে এদের চিত্রন নিশ্চয়ই ব্যক্তি জীবনকে সূচিত করছে, কিন্তু এই সব টাইপগুলিও এক একটি গোষ্ঠীভুক্ত। সাধু তো এককভাবে পৃথিবীতে বিরাজমান নয়। সাধু—সাধুসম্প্রদায়েরই প্রতিভূস্বরূপ। এই রকম ধূর্ত, এইরকম অন্যান্য টাইপ। তাই, এঁরা ব্যক্তিজীবনের আলোক-চিত্রিত হলেও আসলে এরাও সাহিত্যে সমাজসত্তাকে পুষ্ট করছে।

তাই, সাহিত্যে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ-জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নটি জটিল বলা যেতে পারে, কিন্তু সমস্যাসম্বলিত নয় বলেই বিশ্বাস।

দুর্গাদাস সরকার

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে দু একটি কথা

চিত্রকলার সমাদর আজ আর জনকয়েক গুণী ও বিশেষজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। চিত্রকলাকে বোঝাবার ও উপভোগ করার আগ্রহ সাধারণের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। কোলকাতা শহরে চিত্রপ্রদর্শনীর সংখ্যাধিক্য সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। এটা আশার কথা, সন্দেহ নেই। কিন্তু চিত্রকলা ("মডার্ণ আর্ট" বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়) সম্বন্ধে অধিকাংশের মনোভাবই বিরূপ। রসজ্ঞেরা অনেকেই এই মনোভাবের পোষক। আধুনিক চিত্রকলার বহু সমালোচনা করা হয়েছে—নানাভাবে নানা দিক থেকে। কিন্তু এর স্বরূপ বোঝার চেষ্টা আমাদের দেশে বিশেষ হয়নি। এদেশে চিত্রকলার আলোচনা প্রায়শঃই বিশিষ্ট দু'একজন চিত্রকরের সৃষ্টির বিচারে পর্যবসিত হয়েছে—এক প্রাচীন চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা ছাড়া। চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা আধুনিকপন্থী তাঁরা দর্শকের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে আপনমনে এঁকে চলেছেন,—নিজের সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ বা বোধগম্য করার প্রয়াস করেননি। কারণ হয়তো একাজটি সমালোচকদেরই করার কথা—শিল্পীদের নয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি আধুনিক চিত্রকলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা না হয় তবে এই চিত্রকলার প্রতি এক মস্ত অবিচার করা হবে। সাধারণ দর্শকেরাও এক বিরাট রসভান্ডার হতে বঞ্চিত হবেন।

প্রারম্ভেই একটি কথা বলে নিতে চাই। শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্ব এই প্রথম নয়। মানব জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যুগভেদে সংস্কৃতির প্রকাশভংগীর পরিবর্তন ঘটে,—অনেক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। কোন একটি বিশেষ যুগের প্রকাশভংগী পরবর্তীকালে প্রায় অচল হয়ে যায়। সেক্সপীয়রের স্থান ইতিহাসে চিরকালই পুরোভাগে থাকবে। কিন্তু তাই বলে কী বর্তমান যুগের সাহিত্যও সেক্সপীরিয়ান আদর্শে গড়ে উঠবে ? আর তা না হলেই কী আজকের সাহিত্য সাহিত্য নামের যোগ্য হবে না, বস্তুতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে এ প্রশ্নের মীমাংসা বহুদিন আগেই হয়ে গেছে। পূর্বসূরীদের কৃতিত্ব অস্বীকার না করেও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকেরা নিত্য নতুন প্রকাশভংগী গ্রহণ করে চলেছেন। সে সবই আজ সুধীজনের দরবারে স্বীকৃত। সাধারণেও আশ্চর্য দ্রুত গতিতে সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিক প্রকাশভংগীকে ও আধুনিক মানসের প্রতিফলনকে বুঝতে ও সমাদর করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা আধুনিক মানসের প্রতিফলনকে সমাদর করেছেন তাঁরাও চিত্রকলার ক্ষেত্রে "সহজ বোধ্যতার" দাবী জানান। কিন্তু বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সংগে কী আধুনিক চিত্রকলার মেজাজের যথেষ্ট সমতা নেই ?

বস্তুতঃ এই বিরূপতার প্রধান কারণ হোলো আধুনিক চিত্রকলার সংগে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ের স্বল্পতা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে চাক্ষুষ পরিচয়ের আধিক্য থেকেই ক্রমশঃ মনের পরিচয় ঘটে। ছবির রসগ্রহণ তো মূলতঃ চোখের মারফৎই। নতুনের সংগে পরিচয়ের অভাবে চিত্রকলা সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর ধারণাগুলিই আমরা পোষণ করে আসছি—নিজেদের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু বিগত যুগের ধারণাগুলি দিয়ে কী আধুনিক চিত্রকলাকে বোঝা

যাবে? না তাকে ঠিক ভাবে বিচার করা যাবে?

উপযুক্ত রূপে পরিবেশিত হলে ও যথেষ্ট পরিচয় ঘটলে সাধারণ লোকে যে আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন রূপকে স্বীকার করে নিতে পারবে তার উদাহরণ হোলো আধুনিক বিজ্ঞাপন শিল্প, বইয়ের প্রচ্ছদপট ইত্যাদি। বিশেষ করে বাংলা দেশের বইয়ের প্রচ্ছদপট উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার আদর্শকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। বহু বইয়েই প্রচ্ছদপটে আজকাল Abstract Art এর প্রতিফলন হচ্ছে। হয়তো চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে "বোধগম্যতার" বা "অর্থের" আশাকরা হয় বইএর প্রচ্ছদপটের বেলায় তা করা হয় না বলেই পাঠকদের পক্ষ হতে কোন প্রতিবাদ শোনা যায় নি। বিজ্ঞাপন শিল্পও আজকাল Cubism ও অন্যান্য Distortion এর সাহায্য নিচ্ছে যথেষ্ট। এবং সাধারণের পক্ষ থেকে কখনো এই অভিযোগ শোনা যায়নি যে এগুলো বোধগম্য নয়।

বস্তুতঃ ছবিকে 'বুঝতেই' হবে এমন কোন কথা নেই। বহু ছবিই চিত্রকরের মনের অনুভূতির প্রতিফলন। সেই অনুভূতির কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ না থাকতেও পারে। কোন ছবি হয়তো বর্ণিকা সমাবেশে ও গঠন কৌশলের চাতুর্যে, বিশেষ করে 'ফর্মে'র নানা প্রকাশে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতিকে তৃপ্ত করে। সেই সব ছবিতেও 'অর্থ'টা নেহাৎ অপ্রাসংগিক। কেননা তার আবেদন মূলতঃ আমাদের 'অনুভূতির' কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। আবার কবির কল্পনায় যেমন, চিত্রকরের তুলিতেও তেমনি অনেক সময়ই অপ্রাকৃতের মহোৎসব পড়ে যায়। সেই কল্পনা বিলাসের জাগতিক অর্থে কোন 'অর্থ' থাকা প্রয়োজন কী?

বস্তুতঃ ছবির কোন একটা অর্থ বা বিষয়বস্তু থাকবেই এই ধারণা পরিত্যাগ করলে আধুনিক চিত্রকলার রসগ্রহণ করা অনেক সোজা হবে। এছাড়াও আরো একটি ধারণা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। এযাবৎ আমরা ভেবে এসেছি যে ছবি শুধু আমাদের সূক্ষ্মুমার বৃত্তির প্রতিফলন। কিন্তু তা নয়। রস বলতে যেমন শুধু মধুর আর করুণ রস বোঝায় না, বীভৎস রুদ্র এগুলিও বোঝায় ছবির বেলায়ও ঠিক তাই, আধুনিক বহু ছবিই হয়তো আমাদের মনে একটা বিশৃঙ্খল ভাব, ঘৃণা হিংসা, ভয় প্রভৃতি অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলবে,—যে সকল অনুভূতিকে বর্বরের অনুভূতি বলতে আমরা দ্বিধা করবো না। গত যুগের আদর্শে এগুলিকে হয়তো রসোত্তীর্ণ বলা যাবে না। কিন্তু আগেই তো বলেছি, গতযুগের চিত্রকলার আদর্শে এযুগের চিত্রকলাকে বিচার করলে তার ওপর অবিচার করা হবে।

Sarah Newmeyer তাঁর 'Enjoying Modern Art' নামীয় বইয়ে একজায়গায় লিখেছেন—"The modern artist looks at the world—or that part of it he elects to paint—as though it has been created fresh this morning and he is the first to paint a horse, a face, a landscape",

ঐতিহ্যের ভারমুক্ত এই দৃষ্টি জগৎকে আপন কল্পনার রঙ্ মিশিয়ে নিত্য নতুন ভাবে সৃষ্টি করে চলেছে। এজন্যই আধুনিক চিত্রকলায় চিত্রকরের মানসরূপের স্বাক্ষর এতো স্পষ্ট। এজন্যই 'আধুনিক' চিত্রকর যদি গতযুগের কোন আঙ্গিক অনুসরণ করেনও তবু তাকে গতযুগের চিত্র-সৃষ্টি বলে ভুল করার উপায় নেই।

এমন একদিন ছিল যখন প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ করাই চিত্রকরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। আজও অনেক চিত্রকর এই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন। একে আমরা Representational Art বলতে পারি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে বিংশ শতাব্দীতে ফটোগ্রাফীর এমন উন্নতি হয়েছে যে প্রকৃতির প্রতিফলনে রঙ্ আর তুলি প্রায় বাহুল্য হয়ে গেছে। প্রকৃতির

প্রতিফলনের চেয়ে তার অন্তর্নিহিত রূপটি উদ্ঘাটনেই চিত্রকরের কৃতিত্ব বেশী। আধুনিক চিত্রকরের উদ্দেশ্যও তাই। আর এই অন্তর্নিহিত রূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বহিরঙ্গের বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক। Cubism এর ক্ষেত্রে বস্তুর বহিরঙ্গকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহিসাদৃশ্য প্রায় লোপ পেয়েছে। উদ্ঘাটিত হয়েছে বস্তুর, মানবের, অন্তর্প্রকৃতি। আবার কোন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাব বা অনুভূতির ওপর জোর দেবার জন্য বস্তুর বহিরঙ্গের ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি ঘটানো হয়। (এখানে 'বিকৃতি' কথাটিকে আমি বস্তুর স্বাভাবিক আকার হতে বিচ্যুতির অর্থেই ব্যবহার করছি—অসুন্দর অর্থে নয়।) কোথাও বা বস্তু বা তার বহিরঙ্গের বিকৃতি, রঙের সমাবেশ সব কিছুই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো সেক্ষেত্রে প্রতীকের সংগে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংযোগটা স্পষ্ট নয়। শুধু মনোবিশ্লেষণের জটিল পদ্ধতি অনুসারেই সেই সংযোগ সূত্রটি খুঁজে বার করা যাবে। কোন চিত্রকর আবার তুলি আর রঙের সহায্যে তাঁর অবচেতন মনের প্রতিফলন করতে চেয়েছেন। কেউবা ঐতিহ্য, বিষয়বস্তু আঙ্গিক সব কিছুর ভারমুক্ত হয়ে কল্পনার নির্দেশ মেনে চলেছেন। ফলে হয়তো তাঁদের সৃষ্টির সংগে শিশুমনের সৃষ্টির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কেউবা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে মৌলিক জ্যামিতিক ফর্মের ওপর নির্ভর করেছেন। তাঁদের মতে জগতের সব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অঙ্গই হচ্ছে ঐ জ্যামিতিক ফর্ম। কাজেই তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের ছবিতে বিশ্বসৌন্দর্যের মূলতত্ত্বটিকেই তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। মোট কথা, আধুনিক চিত্রকররা আজ আর 'বস্তু'কেই একমাত্র 'বাস্তব' বলে মেনে নিতে রাজী নন। সত্য বা বাস্তবের আপেক্ষিকতা অনুভব করার ফলে তাঁরা নিজ মানসলোকে এক নতুন বাস্তব বা নতুন সত্যকে সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই দৃষ্টিভংগীর সংগে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের ও মানবের অন্যান্য চিন্তাধারার সম্বন্ধ একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রসিদ্ধ কলা-সমালোচক Herbert Read তাঁর Philosophy of Modern Art বইয়ে এসম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

বস্তুতঃ আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যই হোলো বৈচিত্র্য। হয়তো এটা আধুনিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য। Classic, Romantic বা Naturalistic প্রভৃতির মতো কোন বাঁধা ছকেই আধুনিক চিত্রকলাকে ফেলা যাবেনা। Cubism, surrealism, constructivism ইত্যাদি 'ইজমে'র প্রাবল্যে সাধারণের বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে। তবে 'ইজমে'র গোলক ধাঁধাঁয় না গিয়ে যদি খোলামন নিয়ে আধুনিক চিত্রকলাকে দেখা যায় ও বিচার করা যায় তবে তাঁর রসগ্রহণে বাধা হবেনা বলেই মনে হয়।

সম্প্রতি বছর দুয়েক ধরে কোলকাতায় তরুণ চিত্রশিল্পীদের যেসব প্রদর্শনী দেখেছি তা দেখে কিন্তু বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হতে পারছিনা। কয়েকজন খ্যাতিমান চিত্রকর বাদে অধিকাংশই যেন Representational Art এর দিকেই ঝুঁকেছেন। বর্ণ, গঠন কৌশল, আঙ্গিক বা দৃষ্টিভংগী কোনটাতেই যেন তেমন নতুনত্ব, দুঃসাহস আর শক্তির পরিচয় পাচ্ছিনে—যা আধুনিক মানসের বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি শিক্ষাসমাপ্তকারী শিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা শিখেছেন তা সামান্য একটু হের ফের করে দর্শকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। হয়তো আঙ্গিকের চাতুর্য্য আছে কিন্তু কল্পনার দৈন্যও প্রকট। ভেবে দুঃখ হয় যে পশ্চিমের শিল্পীরা যেখানে বিষয় বস্তুর বন্ধনও কাটাতে উদ্যত হয়েছেন সেখানে কোলকাতায় তরুণ শিল্পীরা সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্প রচনা করে চলেছেন। সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে যাঁরা আঁকছেন তাঁদের বিষয় বলার কিছু

নেই। প্রতিযুগেই এমন অনেক শিল্পী থাকেন যাঁরা প্রাচীনের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। এই অক্ষন রীতি অবলম্বন করলে সহজে জনপ্রিয় হবার (বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে) সম্ভাবনা প্রবল,—এটাও ওঁদের পক্ষে একটা যুক্তি হতে পারে। কিন্তু যারা তরুণ, তাদের কাছে আর একটু কল্পনার বিস্তৃতি, একটু দুঃসাহস, জনপ্রিয়তার মোহমুক্তি আশা করা কী অন্যায় হবে?

মীরা দত্ত

'সৌমিত্র সংঘ'এর দুইপুরুষ

সাম্প্রতিককালে বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র ও শিশির ভাদুড়ীর যুগ থেকে এগিয়ে এসে সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে। সেদিক থেকে পরীক্ষা-নিরিক্ষার অন্ত নেই নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করার। কতকগুলি নাটক রজত-জয়ন্তী পালন করারও কৃতিত্ব অর্জন করেছে। 'শ্যামলী', 'আরোগ্যনিকেতন', 'উল্কা' 'শ্রীকান্ত', 'ক্ষুধা' ইত্যাদি নাটকগুলি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ও পেশাদার অভিনেতৃদের নাটক পরিবেশনায় এই বিবর্তনে সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বহুরূপী, লিটল্ থিয়েটার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বাংলার নাট্যামোদী দর্শকদের রুচির পরিবর্তন হয়েছে—একথা স্বীকার করতেই হবে।

সম্প্রতি নূতন এক নাট্যসম্প্রদায় 'সৌমিত্র সংঘ' নাম দিয়ে তারাশঙ্করের নিখ্যাত নাটক 'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ করেছেন রঙমহলে। অগণিত দর্শকের উপস্থিতিতে এই কথাটি মনে হল যে সমাজসমস্যার যে কোন দিক দিয়ে কোন নাটক যদি দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা যায় তাহলে তার আবেদন হবে সার্বজনীন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে 'দুই পুরুষ' অভিনীত হয়েছিল, তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাংলার প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা। ঘটনার প্রেক্ষিত ও বলিষ্ঠ অভিনয়ের গুণে 'দুই পুরুষ' দর্শক মহলে প্রচুর আলোড়ন এনেছিল। তার রেশ এখন হয়ত ফুরিয়েছে। কিন্তু 'সৌমিত্র সংঘ' নূতন করে তাকে মনে পড়িয়ে দিল। বিশেষ করে মহাভারত-এর ভূমিকায় কৃষ্ণকুমার রায়চৌধুরী ও বিমলার ভূমিকায় সাধনা রায়চৌধুরীর অভিনয় ভুলবার নয়। তাছাড়া নটুবিহারীর ভূমিকায় প্রাণেশ সেন, কমলাপদের ভূমিকায় সুরথ সেন ও সুশোভনের ভূমিকায় রমা চক্রবর্তীর সুষ্ঠু অভিনয় প্রসংশার দাবী রাখে। গোপী মিত্রের ভূমিকায় সু-অভিনেতা বরদা মিত্রের অভিনয় আরো উন্নত হবে আশা করা গিয়েছিল।

প্রথম অবদান হিসাবে 'সৌমিত্র সংঘ'র প্রচেষ্টাটি ভালোই বলতে হবে। কিন্তু নাটক নির্বাচনে, পরিচালনা ও পরিবেশনায় যদি ভবিষ্যতে আরও প্রাগ্রসর মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন তাহলে এই সংঘ যে বাংলা নাট্যমঞ্চে স্থায়ী কিছু সংযোগ করতে পারবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অমিতা চৌধুরী

উপেক্ষিত ভিত্তি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে অধ্যাপক ডব্লিউ এ· লুইস্· উন্নয়নের তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ অর্থনৈতিক কাজের বৃদ্ধি, প্রসারমান জ্ঞান এবং ক্রমবর্ধমান মূলধন (Theory of Economic Growth, p. 23).

অর্থনৈতিক কাজ বলতে অধ্যাপক লুইস এমন সব কর্মপ্রয়াসের কথা বোঝেন যা কোন উৎকরণের বা কর্মপ্রক্রিয়ার উৎপাদন বাড়াবে। কিম্বা কোন উৎপাদনপ্রক্রিয়ার খরচ কমাবে। একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি বা ব্যয়সঙ্কোচ বহুলাংশে কাজের ক্ষমতা এবং প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল। আর একথা মানলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে মানবিক উদ্যানের গুরুত্ব সাধারণ বৃদ্ধিতেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যা স্পষ্ট অসাধারণ মস্তিষ্কে তা সবসময় প্রতিফলিত হতে চায় না। আর চায় না, বলেই আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও পরিকল্পনাপ্রণেতাদের কাছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানবিক উপাদানের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে সর্বনিম্নে। এ সত্য ভারী যন্ত্রশিল্পের চোখ ধাঁধান প্রজেক্ট সম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনার ঝোঁক, এবং কৃষিগত রূপান্তর, মজুরীর কাঠামো সংস্কার, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সমাজসেবা সম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনাপতিদের অনীহা থেকেই স্পষ্ট। মধ্যবর্ত্ত উচ্ছেদের মত প্রাথমিক সর্ত্ত বাদ দিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিসংস্কারের সংকল্প আজও অপূর্ণ থেকে গেছে; জমিতে প্রকৃত চাষীর সত্ত্ব এখনও সুনিশ্চিত নয়; ভূমিহীন কৃষকের ভূমিক্ষুধা মেটান সম্ভব হয় নি; প্রথম পরিকল্পনায় জমির খাজনা বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রতিষ্ঠিত করার সাধু সংকল্প ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক রাজ্যের আইন কানুন সেটুকু পর্যন্ত কার্যে পরিণত করতে পারে নি; বহু বিঘোষিত সমবায় গ্রামপরিচালনা (Co-operative Village Management) প্রবর্তিত হওয়া দূরে থাক্, উন্নততর কৃষির জন্য সমবায়মূলক সাহায্য (Co-operative Servicing) পর্যন্ত সহজপ্রাপ্য নয়। এমন কি এই হতভাগ্য দেশের অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার সামান্য বরাদ্দ ৯০ কোটি টাকার সবটুকু পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে খরচ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি আমাদের কর্মিকর্মা উন্নয়ন বিভাগের পক্ষে।

তবু এব্যর্থতা আমাদের কর্তৃপক্ষকে লজ্জিত করে না। এ সত্ত্বেও তারা প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য ঘোষণায় সরব। ভাকরা-নাঙ্গল, সিন্ধ্রি আর চিত্তরঞ্জন দেখিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে পাওয়া সার্টিফিকেটের আনন্দেই তাঁরা বিভোর। কিন্তু বিশেষজ্ঞের সন্ধানী চোখে আমাদের পরিকল্পনার যে মূল গলদ ধরা পড়ে, তা তাঁদের সচকিত করে না। স্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থতত্ত্ববিদ্ র‍্যাগ্নার নার্ক্স কিছুদিন আগে লিখেছিলেন ঃ

"It would not be entirely unfair to say that the Plan relies largely on the introduction of a few big steel mills and engineering plants into an otherwise primitive economy" (Reflections on India's Development Plan; Quarterly

Journal of Economics, May 1957, p. 203).

উক্তটির তাৎপর্য্য পরিকল্পনা কমিশনের পণ্ডিতদের না বোঝার কথা নয়। তবু যে মান্ধাতার আমলের সামাজিক প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের কাজ আগে না করে সেই ভগ্নস্তূপ বুনিয়াদের ওপরেই অত্যাধুনিক যন্ত্রশিল্পের কাঠামো গড়ে তোলার হাস্যকরতা আমাদের নেতাদের চোখে প্রতিভাত হয় না, তার কারণ পরিকল্পনার মানবিক দিক সম্বন্ধে তাঁরা, মুখে না হলেও, কার্যতঃ উদাসীন। মানুষের কথা খেয়ালে থাকলে তবেই তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশের কথা স্মরণে আসে। মানুষকে ভুলে যন্ত্রকেই বড় করে তুলতে গেলে যন্ত্রই আমাদের মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে থাকে; অন্য সবই যে এ অবস্থায় তুচ্ছ হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অবশ্য পরিকল্পনার মানবিক দিক অবহেলিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করাছি বলে এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে উন্নয়নপ্রক্রিয়ার মূল ধনসঞ্চান্ত দিক আমরা অবহেলা করাছি। যে কোন অর্থনৈতিক কাজেই মূলধন অত্যাবশ্যক; উন্নয়নের কাজে তো বটেই। এবং ভারতের মূলধনস্বল্পতা যে আমাদের প্রগতির অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক এ সত্যও অনস্বীকার্য। তবু অন্যতম আর অনন্য সমার্থবোধক নয়; কিন্তু পরিকল্পনাপ্রণেতাদের ভাবভঙ্গী থেকে প্রায় তাই মনে হয়।

অথচ সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে মূলধন সৃজনের (Capital formation) জন্যও মানবিক প্রয়াসের যথাযোগ্য গুরুত্বদান অবশ্য কর্তব্য। কারণ অর্থনীতির নবীন ছাত্রও জানেন যে মূলধনসৃজনের অন্যতম অত্যাবশ্যক সর্ত্ত উৎপাদন বৃদ্ধি; আর সেই উৎপাদনবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে শ্রমিকের সর্ব্বোত্তম উৎপাদন প্রয়াসের ওপর নির্ভরশীল।

এখন প্রশ্ন, কি অবস্থায় শ্রমিকের উৎপাদন প্রয়াস সর্ব্বাধিক করা সম্ভব? এর জবাবে লুইস্ বলছেন, "men will not make effort unless the fruit of that effort is assured to themselves or to those whose claims they recognise", অর্থাৎ, অন্যভাষায় বলতে গেলে, কর্মপ্রবণতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের মনে বিশ্বাস, আশা অথবা স্বার্থত্যাগের উদ্দীপনা জাগান চাই। তাকে বুঝতে দিতে হবে যে তার কর্মপ্রয়াসের ফলে শেষ পর্য্যন্ত হয় সে নিজে লাভবান হবে, অথবা এমন কিছু ঘটবে যার জন্য স্বার্থত্যাগও তার কাছে বাঞ্ছনীয়। এবং এ বিশ্বাস ও আশা সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন আমূল সামাজিক রূপান্তর, যাতে করে শ্রমজীবির মনস্তত্ত্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনুকূল হয়ে ওঠে।

মূলধন সৃজনের মূলে সঞ্চয়ের ভূমিকাও সুবিদিত। শিল্পপতিদের অবাধ শ্রমিক শোষণের সুযোগ দিয়ে সঞ্চয়ের হার বাড়ান চলে; কিন্তু এযুগের সামাজিক বিবেকে সে পন্থা অশ্রদ্ধেয়,—সুতরাং অচল। প্রসারমান রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির মারফৎ পরোক্ষে সঞ্চয় বাড়ান যায়। মুদ্রাস্ফীতি পণ্যমূল্য বাড়িয়ে রাষ্ট্রীয় শিল্পের মুনাফা বাড়াবে; কিন্তু শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি না বেড়ে বরং জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য কমেই যাবে। এর ফলে রাষ্ট্রিয় শিল্পগুলির লাভ বাবদ রাষ্ট্রের সঞ্চয় বাড়বে বলে এ পদ্ধতিতেও মূলধনসৃজনের কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির বিপদও বড় কম নেই। যে কোন উন্নয়নমূলক প্রয়াসে মুদ্রাস্ফীতি কিছু পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু একে আয়ত্তে রাখাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। আর আয়ত্তাতীত মুদ্রাস্ফীতি যে কত বড় সামাজিক আপদ, প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্মাণী ও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কুয়োমিন্টাং চীনের ইতিহাসই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্তারা সচেতন অথবা অসচেতনভাবে মুদ্রাস্ফীতির কিছু ঝুঁকি নিলেও, অন্য পন্থা

খোঁজাই বাঞ্ছনীয়।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় সে পন্থা নিঃসন্দেহে স্বল্প মূলধনে অধিক শ্রমনিয়োগকারী শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের হার বাড়িয়ে সেই বর্দ্ধিত আয়ের একাংশ মূলধনসৃজনের কাজে নিয়োগ। শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্তের স্বল্প সঞ্চয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দু'ভাবে সাহায্য করে। প্রথমতঃ তিল কুড়িয়ে তালের মত, সফল স্বল্পসঞ্চয় আন্দোলনের ফলে সংগৃহীত সম্পদ মূলধনসৃজনকে বিশেষ সহায়ক করবে; দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নপ্রয়াসের ফলে বর্দ্ধিত জাতীয় আয়ের একাংশ এইভাবে সঞ্চিত হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা কমে।

কিন্তু স্বল্পসঞ্চয় আন্দোলন সফল করার জন্যও প্রেরণা দরকার। শুধু ভবিষ্যতের ভাবনা ছাড়াও, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রেরণা এ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু সেজন্য চাই জনসাধারণের মনে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা। সোভিয়েট রাশিয়া ও ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক দেশে শ্রমিক সংঘগুলিও স্বল্পসঞ্চয় আন্দোলনে বিশেষ সাহায্য করেছে। আমাদের দেশেও শ্রমিক সংঘ ও কৃষকপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগ অর্জনে সরকার সক্রিয় হতে পারতেন। কিন্তু সেজন্যও দরকার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। পরিকল্পনার মানবিক রূপান্তর ছাড়া এ সফলতা আসতে পারে না। আর সেই মানবিক রূপান্তরের অর্থ প্রতিষ্ঠানিক বিপ্লব (institutional revolution), উদ্বৃত্ত জনবলকে কাজ দেবার জন্য শ্রম নিয়োগকারী শিল্পের প্রসার এবং চিকিৎসা, শিক্ষা ও সমাজসেবার গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান। আজকের মাধাভারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও ভারী যন্ত্রশিল্পের মোহে বিমূঢ় পরিকল্পনার কাঠামো তাতে অটুট থাকবে না ঠিকই; কিন্তু মানুষের বিশ্বাস গড়ে উঠবে। আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ-গঠনের তাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

সুব্রতেশ ঘোষ

সমালোচনা

ইতিহাসের মুক্তি ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২·৫০ টাকা।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি ও শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ জীবিত ঐতিহাসিক-দের সাধনায় বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস শাখা সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেই তুলনায় ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় বাংলা সাহিত্যে রচনা বিরল। বাঙ্গলা সাহিত্যের নানা বিভাগের মত রবীন্দ্রনাথ এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁহার এই শ্রেণীর আলোচনার একটি সংগ্রহ বিশ্বভারতী কর্তৃক "ইতিহাস" নামে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয়ের "ইতিহাসের মুক্তি"ও এই জাতীয় রচনা। "ইতিহাসের মুক্তি" চারিটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম দুইটি প্রবন্ধ 'ইতিহাসের মুক্তি' ও 'ইতিহাসের রীতি' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৫ সালের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা। দুইটি প্রবন্ধ "বৈজ্ঞানিক ইতিহাস" ও "ইতিহাস" যথাক্রমে সবুজপত্র ও বিচিত্রা হইতে পুনর্মুদ্রিত। প্রথম প্রবন্ধটিতে লেখক যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মনুস্মৃতি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গৌতমধর্মসূত্রে ইতিহাসের উল্লেখ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে আমাদের দেশে ইতিহাস বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডেসকে আধুনিক ইতিহাস বিদ্যার গুরু বলা হয়, অনলঙ্কৃত নিরাবরণ সত্য তাঁর রচনায় প্রতিফলিত, ইউরোপের মধ্যযুগে এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা সকল বিদ্যার মত ইতিহাসেরও লক্ষ্য হইয়া পড়ে। বর্তমানে ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে—রাষ্ট্র, ধর্মগুরুর স্থানে আছেন রাষ্ট্রনেতা, ইঁহাদের মতে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নহে, ইতিহাসের লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মঙ্গল। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই বন্ধন হইতে মুক্তি—ইতিহাসেরও মুক্তি। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে গুপ্ত মহাশয়ের ইহাই বক্তব্য।

"ইতিহাসের রীতি" প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য গুপ্ত মহাশয়ের ভাষায়, "মানুষের ঋজু কুটিল পথে বিচিত্র জাতির যে বিস্ময়, মানুষের মনে সে বিস্ময় জাগাতে পারলেই ঐতিহাসিক ধন্য হবেন।"

"বৈজ্ঞানিক ইতিহাস" প্রবন্ধে ইতিহাসের সম্বন্ধে "বিজ্ঞানসম্মত" ও "বিজ্ঞানানুমোদিত" কথাগুলির অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ইতিহাসের রীতিতেও এই আলোচনা থাকায় নূতন করিয়া আবার এই আলোচনা না করিলেও চলিত। একজন পরলোকগত ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দোহাই দিয়া নিজেই ইহা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ইহা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দোষ নহে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে সবুজপত্রে প্রকাশের সময় এই প্রবন্ধ সময়োচিত ছিল, দীর্ঘকাল পরে স্থায়ীভাবে এই প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিলেই ভাল হইত। এই প্রবন্ধটি গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাই। গুপ্ত মহাশয়ের 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি বাঙ্গলা সাহিত্যে বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া

গিয়াছে। ইতিহাসাচার্য সদ্যলোকান্তরিত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রদত্ত অভিনন্দের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল কি করে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়" (ডিসেম্বর, ১৯৪৮)। শেষ প্রবন্ধ "ইতিহাসে" ইতিহাসকে গুপ্ত মহাশয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন। প্রাচীন ইতিহাসের বর্তমানকে চেনবার শক্তি কত কম এ সম্বন্ধে লেখক ঐতিহাসিক গিবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসী বিপ্লবের দুই বৎসর পূর্বে গিবন তাঁহার রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংসের বারোশো বছরের ইতিহাস রচনা শেষ করেন। তাঁহার সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার আসন্ন ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই—তাঁহার সমসাময়িক ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা লইয়াই তিনি রোমসাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস সমাপ্ত করেন।

"মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টিলীলার দর্শক।" "ইতিহাস" প্রবন্ধের ইহাই শেষ কথা।

ভাষার কারুকার্যে চিন্তার গভীরতায় ও বিষয় গৌরবে তথ্য সমৃদ্ধ এই পুস্তকখানি বাঙ্গলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করিবে। সুমুদ্রন ও গ্রন্থন ব্যাপারে বিশ্বভারতীর সুনাম এই পুস্তকেও অব্যাহত রহিয়াছে।

বাঙ্গলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ১·৫০ টাকা।

বাঙ্গলার তথা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষিদের দান অপরিমেয়। এই সময়ের অন্যান্য বহু মনীষী ও প্রতিষ্ঠানের নাম বর্তমান যুগে বিস্মৃত প্রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সাধনার ইতিহাস আলোচনার পথিকৃতের গৌরব নিঃসন্দেহে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। ব্রজেন্দ্রনাথের সহকর্মী ও উত্তর সাধক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় আলোচ্য পুস্তকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান ও এইসব বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতি ও সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও কর্মধারার আলোচনা করিয়াছেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম ও রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা সম্ভবতঃ বহুশ্রুত বিধায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আলোচিত সভাসমিতিগুলির নাম ও কর্মপ্রণালী বিচিত্র এবং বহুলাংশে সাধারণ পাঠকের অপরিজ্ঞাত। গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রভৃতি ২০।২২টি প্রতিষ্ঠানের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুবক-বাঙ্গলার প্রগতিশীলতা ও প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচয় এই সব প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অতি সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যতে বাঙ্গলার নবজাগরণের ইতিহাস রচকের পক্ষে পুস্তকখানি অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই পুস্তকখানির লেখক এবং প্রকাশক উভয়েই পাঠকের ধন্যবাদার্হ। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন চরিত ॥ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। মূল্য পাঁচটাকা বার আনা।

গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে লেখক নিজের জীবনের একটি বিশেষ অংশের কাহিনী বলছেন। আঠারোশো সাতান্নর বিপ্লবের যে অংশে তিনি নিজে জড়িত ছিলেন সেইটুকুই তাঁর জীবন চরিতের মূল বক্তব্য। নিজের জীবনের অংশটুকু ব্যক্ত করায় তাঁকে কল্পনার দ্বারা না-দেখা ঘটনা গড়ে নিতে হয়নি। তাই তাঁর বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে না মনে।

আত্মজীবনী সম্বন্ধে বালজাক্ বলেছিলেন, "the most moving novels are autobiographical Studies or narratives of events submerged in the ocean of the world." বিদ্রোহে বাঙালী সেই ধরণের আত্মকথামূলক কাহিনী যার গল্পরস চমকপ্রদ উপন্যাসের চেয়ে অল্প নয়। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে আজ থেকে একশো বছর আগে এক বাঙ্গালী সন্তান কেমন করে নিজের ভাগ্য সন্ধান করতে গিয়েছিলেন সে কাহিনী শোনবার মত। রচনার মধ্যে আগাগোড়া নিজের কথা বললেও সে বলা আত্মপ্রচারের ভঙ্গীতে নয়। তাই একটানা পড়ায় ক্লান্তি আসেনা কখনো।

বাঙ্গালীর জীবনে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অল্প। অন্য কোন দ্বিতীয় আত্মজীবনীর কথা স্মরণ করতে পাচ্ছি না যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের অসিঝঞ্ঝনার মধ্যে কাহিনী অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেই অরাজকতার দিনে চতুর্দিকে নির্মম হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ক্ষমতালুব্ধের দল যথেচ্ছ অত্যাচারের দ্বারা তাদের ক্ষমতা সপ্রমাণ কর্চ্ছে। স্ত্রীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ ক্ষিপ্ত সৈন্যদলের সামনে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ছে।—এমনি সময়ে মুসলমান নবাবপক্ষীয় সৈন্যেরা লেখকের সন্ধানে সহর তোলপাড় করে ফিরছে। যুদ্ধক্ষেত্রের নির্মমতার মধ্যে পলাতক লেখক আশ্রয় পেলেন পান্না বাঈজীর ঘরে। বেরিলীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পান্না লেখককে তার গুপ্ত গৃহে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিল। তার পুরস্কার সে পেয়েছিল, লেখকের ভাষায়ই শোনা যাক্—"কিরূপে পান্নাকে বাঁধিয়াছিল, কিরূপে পান্নাকে তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিতে গিয়াছিল, কিরূপে পান্নার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিরূপে পান্নার অঙ্গে তীক্ষ্ণধার সূচিকা বিদ্ধ করিয়াছিল, কিরূপে পান্নাকে সহস্রাধিক টাকা দিবার লোভ দেখাইয়াছিল, সমস্ত কথা পান্না একে একে আনুপূর্বিক বিবৃত করিল।...পান্নার অনুগ্রহে, পান্নার বুদ্ধির জোরে, পান্নার আত্মত্যাগে আমি সে যাত্রা পাতাল ঘরে লুকাইয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

এমনি বহু কাহিনী, বহু বিচিত্র চরিত্র লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে পাঠকের সামনে এনে ধরেছে। বহুকাল পূর্বে জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত এই কাহিনীর পুনর্মুদ্রণ করে প্রকাশক বাংলার রসিক পাঠকবৃন্দের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সোমেন বসু

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বি জ য় - বৈ জ য় ন্তী বা হী

মোহিনী মিলস্ লিমিটেড্

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা) ২নং মিল বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমকালীন

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি :

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক ষান্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

লেখকের প্রতি :

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, **কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।** দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশকদের প্রতি :

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও ছোট গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য

ফোন : ২৩-৫১৫৫